বৈশাখ, ১৩১৪।

সম্পাদক—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, এম্‌, এ, বার-এট্‌-ল।

প্রকাশক—
শ্রীকেদারনাথ দাস-গুপ্ত

সূচী।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিনের ভাণ্ডার প্রকাশিত হইয়া ১৩১৪ সা
ভাণ্ডার ছয় মাসেই সমাপ্ত করা হইল। ভাণ্ডারের বার্ষিক যে :
ধার্য্য ছিল এই ছয় মাসে তাহার অর্দ্ধেক মূল্য গ্রাহকদিগের নিং
হইতে লওয়া হইবে। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়াছেন তাঁহাদের অর্দ্ধে
মূল্য চতুর্থ বর্ষের মূল্য মধ্যে জমা হইবে।

চতুর্থ বর্ষ হইতে "ভাণ্ডার" "সমালোচনী"র সহিত মিলিত হইল
"সমালোচনী" ও "ভাণ্ডারে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
ইহা সচিত্র হইবে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় সংখ্যা প্রস্তুত হইয়াছে
চতুর্থ বর্ষের সমালোচনী ও ভাণ্ডার যাহাতে সকল বিষয়ে পাঠকে
মনোরঞ্জন করিতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। প্রথম তি
সংখ্যার মূল্য মায় ডাকমাশুল।৵০ পাঁচ আনা। বিনামূল্যে নমু
প্রেরণের জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না। বঙ্গের অধিকাংশ সুলেং
এই মাসিক পত্রিকার লেখক।

চতুর্থ বর্ষ হইতে যাঁহারা সমালোচনী ও ভাণ্ডারের গ্রাহক হইতে
চান তাঁহারা পত্র লিখিলে ভি, পিতে কাগজ পাঠান যাইবে। কেহ
ইচ্ছা করিলে মণিঅর্ডার করিতে পারেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাণ্ডার।

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।

সূচীপত্র।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কাৰ্ত্তিক প্রেসে
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

তৃতীয় বর্ষের সূচী।

তৃতীয় বর্ষের ভাণ্ডারে যাঁহাদের লেখা প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাদের নাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীম—, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মৌলবী সিরাজুল ইস্‌লাম, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন ডাক্তার চুনিলাল সেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল কর, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

ভাণ্ডার।

তৃতীয় বর্ষ] বৈশাখ। [প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষ।

কি ব'লে নূতন বর্ষ! সম্ভাষি তোমায়
নবীন প্রভাতে?
শরীর দুর্ব্বল ক্ষীণ,
শোণিত গরল লীন,
অশ্রুধারা জ্যোতিহীন
নয়নের পাতে—
ফোঁসিছে প্রাণের প্রান্ত আসন্ন মরণ!
কি সুখে সম্ভাষি তোমা বরষ নূতন?

গত অব্দে ভারতের প্রতি গৃহে গৃহে
প্রতি বক্ষতলে,
মর্ম্মান্তিক হাহাকার
উঠিয়াছে অনিবার;
ম্লান প্রতিধ্বনি তার—
এখনো উথলে!
ভীষণ অনল শিখা দহিয়াছে সব;
উড়িতেছে ভস্মরাশি এখনো ভৈরব!

অকাল ভয়াল-দ্রংষ্ট্রা, প্রচণ্ড তাণ্ডবে
নির্ম্মম ক্রন্দনে,
অভাগিনী জননীর—
ছিঁড়েছে বুকের শির!
রত্নাঞ্চলা প্রতীচীর
আনন্দ নন্দনে;
অন্নাভাবে জলাভাবে ওষ্ঠাগত প্রাণ,
তার উপরি মহামারি রচিছে শ্মশান!

ততোধিক রাজরোষ তীব্র কষাঘাতে—
করেছে অধীর;
গলায় পরেছি ফাঁস
আমরা দুর্ব্বল দাস,
রুদ্ধ শ্বাস, রুদ্ধ ভাষ,
লুণ্ঠিত শরীর;
কারা গৃহে কত ভাই ক্ষয়িছে জীবন!
কি সুখে সম্ভাষি তোমা বরষ নূতন?

তবু এস, নব বর্ষ, এই ধ্বংশপুরে
নবীন জীবন!
পরাণের আর্ত্ততান,
আজি আমন্ত্রণগান,
শোক জীর্ণ দু'নয়ান,
স্বাগত-কেতন!
সময়ের প্রতিনিধি! আশার স্বপন!
হৃদয় দিয়েছি পেতে কর সিংহাসন!

লঙ্কা।
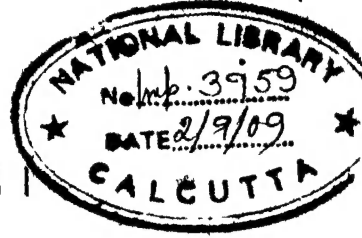
(১) লঙ্কার সংস্থান ও শক্তি।

ত্রিকূট-পর্ব্বতশীর্ষে লঙ্কা অবস্থিত। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ভীষণ পরিখা, তাহার অগাধ জলরাশি নক্র ও হাঙ্গরের ক্রীড়াক্ষেত্র। এই পরিখার উপরে চারিটি বিস্তৃত সেতুপথ ছিল; শত্রু উপস্থিত হওয়া মাত্র সেই সেতুগুলি যন্ত্রদ্বারা উত্তোলিত হইত। শত্রুগণ পরিখার মধ্যে পড়িয়া মরিত। পরিখা পার হইলে চারিটি পুরদ্বার দৃষ্ট হইত, সেই সকল দ্বারে ইষুপলনামক যন্ত্রসকল স্থাপিত ছিল, উক্ত যন্ত্রযোগে শতঘ্নী প্রভৃতি লৌহ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুসৈন্যের আক্রমণ নিবারিত করিত। দ্বারসমূহ দৃঢ় কপাটবদ্ধ, এবং তাহাদের উপরিভাগে তীক্ষ্ণ পরিঘসকল সংলগ্ন ছিল। এই সকল দ্বারে খড়্গ-চর্ম্ম-শূল ও ধনুহস্ত, অশ্বারোহী পরাক্রান্ত রাক্ষসসৈন্য সর্ব্বদা প্রহরীরূপে বিচরণ করিত।

লঙ্কায় চারি প্রকার দুর্গ, জলদুর্গ, নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ। শেষোক্ত দুর্গ কি প্রকার তাহার আভাষ আমরা রুষজাপানযুদ্ধে পাইয়াছি। কৃত্রিম সশস্ত্র মনুষ্য-মূর্ত্তিসংকুল কৃত্রিম দুর্গাকৃতি, দূর হইতে সুদৃঢ় দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয় --শত্রুসৈন্য দূর হইতে তাহা দেখিয়া ভয়ে অন্য পথে গমন করে।

লঙ্কার চতুর্দ্বারে সুদৃঢ় ও বৃহৎ স্তম্ভসকল বিরাজিত ছিল, রাবণ স্বয়ং ধীরভাবে সেই স্থানে সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া স্বীয় সৈন্যের বলাবল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সীতাহরণের পর হইতে রাবণ সর্ব্বদা সতর্কভাবে পুররক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

(২) লঙ্কার ঐশ্বর্য্য।

লঙ্কার চতুর্দ্দিকে বিশাল প্রাচীর ছিল,—উহা স্বর্ণনির্ম্মিত নহে—স্বর্ণ-মণ্ডিত। "কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্"। (সুন্দর ২।১৬)

পূর্ব্বকালে স্বর্ণ ও হীরা-মণি গৃহসজ্জায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত। এই সকল মহার্ঘ সামগ্রী কেবল রমণীকণ্ঠ-কর ও শিরোভূষণে প্রযুক্ত হইত না, নাগরিক মন্দিরসমূহের শ্রীবর্দ্ধনের জন্যও ইহাদের প্রয়োজন হইত। ক্রমশঃ দৃষ্ট হইল, মূল্যবান্ রত্নের ঐরূপ ব্যবহার নিরাপদ নহে, শত্রুরা লুটিয়া লইয়া যায়—সুতরাং যাহা চক্ষুর প্রিয়দর্শন, তাহা চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। মন্দিরের গাত্র ছাড়িয়া উহারা রাজকোষে আশ্রয় লাভ করিল।

লঙ্কায় যে হাটে-ঘাটে মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি দৃষ্ট হয়, তা কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হয় না, সেই যুগে ঐসকল সামগ্রী পুর-শোভাবর্দ্ধনে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত। চারিশত খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান পেশ-ওয়ার প্রভৃতি স্থানে বহুমূল্য প্রস্তরখচিত অনেকগুলি মন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তাজমহলের গাত্রে মূল্যবান্ প্রস্তর সকল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

লঙ্কাপুরী অনেকগুলি মহাপথে সুবিভক্ত ছিল। রাবণের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ বিপুল তোরণ রৌপ্যনির্ম্মিত। তন্মধ্যে স্বর্ণের বিচিত্র কারুকার্য্য ছিল, এই তোরণে বিচিত্র কুসুমশোভী লতাপঙ্‌ক্তি বিরাজিত ছিল। রাজপ্রাসাদে সপ্ততল ও অষ্টতল গৃহ অনেকগুলি ছিল, উহাতে বিচিত্র মণিখচিত নানাবর্ণের স্তম্ভ দৃষ্ট হইত। রাজপ্রাসাদ বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট ছিল, এই শৃঙ্গ বা কূটসকলের শীর্ষে কিঙ্কিণীবেষ্টিত পতাকা উত্থিত ছিল, মন্দপবনে বিচলিত হইয়া কিঙ্কিণীগুলি সর্ব্বদা সুমধুর রবে বাজিয়া উঠিত। রাবণের প্রাসাদবর্ণনা পড়িলে মাদুরার প্রাচীন মন্দির ও অজন্তার পাষাণ-গৃহগুলি মনে পড়ে—দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনের সঙ্গে আদিকবি-বর্ণিত

এই সকল গৃহের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। উভয় স্থলেই কূট বা শৃঙ্গের প্রাচুর্য্য ও বহুসংখ্যক স্তম্ভের শ্রেণী রাজিত। রাজপ্রাসাদের কপাটগুলি স্বর্ণনির্ম্মিত, গৃহ-বেদী বৈদূর্য্যমণিকৃত, বৈদূর্য্যমণি ও স্ফটিক এতদুভয়ের যোগে সোপানাবলী রচিত। গবাক্ষে স্বর্ণজাল, কোথায় বা বজ্রজাল, এই বজ্র বোধ হয় ইস্পাৎ।

কোন কোন গৃহের আকৃতি অঙ্কুশ ও বজ্রের ন্যায়; যবদ্বীপের বরোবোদর মন্দিরের অনেকগুলি গৃহ এখনও অঙ্কুশ বা বজ্রাকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সকল গৃহের তিনটি কূট, মধ্যস্থ কূট সমধিক উচ্চ।

রাবণের শয়ন-স্থান বৈদূর্য্য-মণিনির্ম্মিত বেদী, তাহা স্বর্ণ ও হস্তিদন্তের চিত্রে খচিত। তদুপরি বহুমূল্য স্বর্ণখচিত আস্তরণ; এই বেদীর উপরে শুভ্র চন্দ্রাতপ, তাহার চতুর্দ্দিকে বহুমূল্য বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রনির্ম্মিত স্রজ বা ঝালর। সেই বেদীর পার্শ্বে কৃত্রিম রমণীমূর্ত্তি, তাহাদের হস্তধৃত ব্যজন সর্ব্বদা যন্ত্র-চালিত।

রাবণের গৃহে রাত্রে স্বর্ণপাত্রে দীপ প্রজ্জ্বালিত হইত, এই দীপগুলি সুগন্ধিতৈল-নিষিক্ত হওয়াতে গৃহ সুরভিতে ভরপূর থাকিত।

সুগন্ধের প্রতি রাক্ষসগণের বিশেষ স্পৃহা ও অনুরাগ লক্ষিত হয়। অগুরু চন্দন ছাড়াও নানাপ্রকার সুগন্ধদ্রব্যের ব্যবহার ছিল, যখন হনুমান্ রাবণের শয়নপ্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন, তখন পর্য্যাপ্ত সুগন্ধের দ্বারা রাবণ কোথায় ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

সগন্ধস্তং মহাসত্তং বন্ধুর্বন্ধুমিবোত্তমম্।
ইত এহীত্যুবাচেব তত্র যত্র স রাবণঃ॥ (সুন্দর ৯।২১)

সেই গন্ধ যেন বন্ধুর ন্যায় হনুমানকে পথ দেখাইয়া বলিল, "যেস্থানে রাবণ আছে আমার সহিত তথায় আইস।" নানাপ্রকার সুগন্ধ পুষ্পের ব্যবহারের বর্ণনা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাবণ রাত্রিকালে লঙ্কাপুরীর একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করিলে

সঙ্গে সঙ্গে বহু সুন্দরী রমণী স্বর্ণদীপ হস্তে লইয়া অনুগমন করিত, কোন কোন রমণী স্বর্ণভৃঙ্গার কেহ বা গজদন্তখচিত স্বর্ণমণ্ডিত স্ফটিক-আসন, কেহ পূর্ণ-চন্দ্রপ্রভ ছত্র, কোন রমণী স্বর্ণদণ্ড, কেহ বা ব্যজন, আবার কেহ বা মদিরাপূর্ণ স্বর্ণপাত্র ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইত। বৌদ্ধ শ্রামণ্যসূত্র-ফলগ্রন্থে অজাতশত্রুর নৈশ-ভ্রমণোপলক্ষে একশত রমণীর স্বর্ণদীপ হস্তে লইয়া অনুগমন করিবার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং এই বর্ণনা পাঠ কালে রাবণের চরিত্রসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রচার না করিয়া উহা সেকালের রাজপদ্ধতি অনুযায়ী বলিয়া গ্রহণ করা যায়। রাবণের পরিধানে ধুতি রক্তবর্ণ, তাহার প্রান্ত স্বর্ণখচিত। স্থূল শ্রোণী সূত্রের মেখলাদ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। প্রাচীন বাসুদেব মূর্ত্তি ও অজন্তার রাজন্যচিত্রের কটিদেশে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মেখলা দৃষ্ট হয়। রাবণের উত্তরীয় অমৃত ফেণের ন্যায়, এই উপমার দ্বারা উত্তরীয় বস্ত্রের সূক্ষ্ম শিল্প ও শুভ্রতা উভয়ই প্রতিপন্ন হইতেছে। রাবণের গৃহে অঙ্গদাদি নানা আভরণের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন প্রকার অঙ্গরক্ষার (জামার) উল্লেখ নাই; প্রাচীন দেব-মূর্ত্তিগুলিতেও বক্ষবিরাজিত বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত হার, বাহুমূলে অঙ্গদাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হইয়া থাকে, উত্তরীয় ভিন্ন অন্য কোনরূপ বস্ত্র তাহাদের অঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণের বর্ণনা পড়িলে এই সকল পাষাণ-বিগ্রহের সাজ-সজ্জার কথাই বারংবার মনে পড়ে। অজন্তার চিত্রে পুলকেশী রাজার দরবারগৃহে পারস্যাধিপের দূতের আগমন প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে পারস্য দূতের অঙ্গের জামাজোড়া ও মাথার টুপি অনেকটা এখানকার পার্শীদের পরিচ্ছদাদির অনুরূপ। অথচ পুলকেশী রাজার অঙ্গে কোন জামা নাই। তাঁহার বক্ষ কপাটের ন্যায়, তাহাতে মণিহার ও পুষ্পস্রজ পরিশোভিত। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই গ্রীষ্মাতিশয্যে অঙ্গের কোন প্রকার আঁটা-আঁটি আবরণের প্রচলন হয় নাই। লঙ্কার সৈন্যমণ্ডলী বর্ণনায় কবচ ও বর্ম্মের উল্লেখ আছে।

রাবণের মস্তকের মুকুটের যে বর্ণনা আছে তাহার গঠন কতকটা বরের মুকুটের মত।

স্ত্রীলোকদিগের ভূষণবর্ণনায় হার, কেয়ূর ও অঙ্গদাদির সঙ্গে বহুমূল্য নিষ্কের উল্লেখ আছে; নিষ্ক অর্থ মুদ্রা বা পদক উহা রমণীগণের কোমল কণ্ঠে শোভা পাইত।

ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে স্বর্ণের পাত্র ও করকের উল্লেখ অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। রৌপ্য অর্থাৎ বৃহৎ স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণকলসী, মণিময় পাত্র, ও শুভ্রপ্রস্তর-নির্ম্মিত বহুমূল্য মণিখচিত পাত্রের বর্ণনা আমরা রাবণের পানাগারে প্রাপ্ত হই। ইহা ছাড়া স্ফাটিক পাত্রের উল্লেখও অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্ফাটিক পাত্র কি প্রকার, তাহার নিদর্শন আমরা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেবের অস্থিশেষ যে পাত্রে রক্ষিত হইয়াছিল এবং যাহা মিঃ পেপি পীপড়াও গ্রামের স্তুপ খুঁড়িয়া পাইয়াছিলেন তাহা স্ফাটিক পাত্র। দেখিলে মনে হয় আধুনিক একটি উৎকৃষ্ট কাচপাত্র, তাহার গড়ন ও ঔজ্জ্বল্য উৎকৃষ্ট বিলাতি কাঁচপাত্র হইতে কোন অংশে নিম্নশ্রেণীর নহে—অথচ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অসির চর্ম্মাচ্ছাদন সাধারণতঃ ভল্লুকের চর্ম্মে নির্ম্মিত হইত, গোধিকার চর্ম্মে অঙ্গুলিত্রাণ (Gloves) প্রস্তুত হইত। উচ্চশ্রেণীর সৈনিকেরা স্বর্ণনির্ম্মিত খড়্গমুষ্টি বাঁট ব্যবহার করিতেন। রথগুলির উপরিভাগ ব্যাঘ্র ও সিংহের চর্ম্মে আবৃত করা হইত। হস্তীসমূহের দন্ত স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত হইত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ, মুরজ, ডিণ্ডিম, চেলিকা প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লঙ্কায়ও শিবিকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বোধ হয় তথায় রথের ব্যবহারই বেশী ছিল; কিষ্কিন্ধ্যার শিবিকাসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা প্রাপ্ত হই; তথায় রথের প্রচলন ছিল না—সুগ্রীব স্বয়ংও শিবিকারোহণে গমনাগমন করিতেন।

অশোকবনে যে চৈত্য-প্রাসাদের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, মাদুরায় পর্ব্বত-গহ্বরে এখনও সেরূপ প্রাচীন গৃহ অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে।—ক্রীড়া-গৃহ, পানশালা, অস্ত্রাগার, যন্ত্রাগার প্রভৃতি অনেক স্থল বর্ণিত হইয়াছে। দারুপর্ব্বতের বর্ণনা অনেক স্থলে আছে, উহা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কৃত্রিম পাহাড়। ইহা ছাড়া ক্রীড়াগৃহের প্রাঙ্গণে পতাকা শোভিত লৌহযষ্টির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহার উপর ময়ূরগণের নৃত্যস্থান ছিল। যখন বর্ষার মেঘমালা ইন্দ্রচাপের মণ্ডলী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া গুরুগম্ভীর গর্জ্জন করিত, তখন সেই ধ্বজ-যষ্টির উপর ময়ূরগণ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিত ও কেকারব করিত।

কৃত্রিম পাহাড়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া কৃত্রিম বৃক্ষ ও কৃত্রিম ফুলের উল্লেখও দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রমোদ-উদ্যানে একটি বাপীর বর্ণনা আছে, তাহার সোপান হেম ও মণিময়,—পার্শ্বে সিকতার স্থলে মুক্তাপ্রবালচূর্ণ। বাপীর কুট্টিম স্ফাটিক পার্শ্বে স্বর্ণ-নির্ম্মিত কৃত্রিম তরুতে মণিময় কৃত্রিম পুষ্প।

ভাস্করশিল্পের অনেক নিদর্শন আছে, তন্মধ্যে পুষ্পক রথ সর্ব্বপ্রধান। ইহার উপরে বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত পক্ষী, এবং নানাবর্ণের প্রস্তররচিত সর্প-মূর্ত্তি ঠিক জীবন্ত সর্পের ন্যায় পরিশোভিত ছিল, তাহা ছাড়া রৌপ্য ও প্রবালনির্ম্মিত পক্ষী, বিচিত্র বর্ণের প্রস্তররচিত পক্ষে শোভা পাইত, কৃত্রিম অশ্ব এই রথে সংযোজিত ছিল। কুণ্ডলশোভিত বদনমণ্ডল দোলাইয়া নিশাচরগণ এই রথ বহন করিত।

উপবনের মধ্যে একটী লক্ষ্মী-(শ্রী)-মূর্ত্তি শোভা পাইত, দুই দিক হইতে হস্তীদ্বয় তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিতেছে, এবং পদ্মাসনা দেবী পদ্ম হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সুন্দরকাণ্ডের ৭ম সর্গের চতুর্দ্দশ শ্লোকের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া ফার্গুসান সাহেবের ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ইন্দোরে নির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তির চিত্র

দেখুন, দুইই এক। প্রতিমূর্ত্তি কিরূপ অবিকল গঠিত হইত তাহার একটি দৃষ্টান্ত এই যে, রাবণের আদেশে নির্ম্মিত মায়া-সীতার কর্ত্তিত মুণ্ড দেখিয়া হনুমান্ উহা সত্য সত্য সীতার মস্তক মনে করিয়াছিলেন।

চিত্রশালার উল্লেখ অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাবণের নিদ্রিত কোন মহিষীর বর্ণনায় একস্থলে উল্লিখিত দৃষ্ট হয় যে, নিদ্রাকালে তাঁহার বক্ষ নিশ্বাসপ্রবাহে ঈষদুন্নতনত হইতেছিল এবং বস্ত্রাঞ্চল বিচলিত মনে হইতেছিল, তাহাতে মনে হইল যেন একখানি সুন্দর ছবি মন্দবায়ুতে দুলিতেছে। (সুন্দর ১০।১৩)

(৩) খাদ্যাখাদ্য।

রাক্ষসগণের অখাদ্য আবার কি থাকিবে? বাল্মীকি রাবণের পানশালা বর্ণনায় তাহাদের আহার্য্যের তালিকা দিয়াছেন। রাক্ষসগণ রাত্রি জাগরণ করিত, এজন্যই তাহারা নিশাচর। রাত্রিকালে রাবণ মহিলাগণ পরিবৃত হইয়া নৃত্য বাদিত্রাদির অনুষ্ঠান করিতেন। তখন কুক্কুটের ও শূকরের মাংসের অত্যন্ত আদর হইত, তাহা ছাড়া ছাগ, বরাহ এমন কি মহিষের মাংস পর্য্যন্ত রাক্ষসী ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় হইত। এই সকল মাংস দধি, অম্ল ও লবণ সংযোগে সুস্বাদু করা হইত; মাংসের সঙ্গে অপর্য্যাপ্ত সুরা ব্যবহৃত হইত। নিম্নলিখিত সুরাগুলি রাবণ ও তদীয় মহিষীবর্গের বিশেষ প্রিয় ছিল।

শর্করা হইতে 'শর্করাসব' প্রস্তুত হইত। মধু, কাহারও কাহারও মতে দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত 'মাধ্বীক', মনর্ক পুষ্পাসারে প্রস্তুত 'পুষ্পাসব' এবং খর্জ্জুর ফল হইতে প্রস্তুত 'ফলাসব' এই সকল মদিরা সুগন্ধি দ্রব্য চূর্ণ দ্বারা সুরভি সংযুক্ত করা হইত।

রাত্রিকালে রমণীগণ ও তৎসঙ্গে রাবণ এই সুরাপান ও মাংসভোজন করিয়া নৃত্য গীতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। স্বর্ণপাত্র, মণিপাত্র, এমন কি

স্ফাটিক কলসী দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া যাইত, অর্দ্ধভক্ষিত কুক্কুট (কুক্কুটান্ অর্দ্ধভক্ষিতান্) ও নানা প্রকার ফল ও বীজ সেই পানাগারে বিক্ষিপ্ত হইত, ও মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া মহিষীগণ রাবণের সঙ্গে প্রবৃত্তিদেবীর অশেষরূপ সাধনা করিতেন। এই দৃশ্য যতই কেন সুন্দর হউক, ইহা বর্ণনা করিয়া বাল্মীকি ঋষি একবার মুখ ফিরাইয়া বলিয়াছেন, গোসকলের মধ্যে বৃষ যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, রাবণও মহিলামণ্ডলে তেমন বিরাজিত হইতেন। (সুন্দর ১১।১১)

(৪) হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন।

যদিও হনুমান আকাশে উড্ডীন হইয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এরূপ বর্ণিত আছে, তথাপি সে সময়ে যে সমুদ্রে নৌকা চালিত হইত, তাহার উল্লেখ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, মহানৌকা অর্থ জাহাজ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"প্রতি লোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে।" (সুন্দর ১।১৮০)

সাগরে মারুতাবিষ্টা নৌরিবাসীত্তদা। (সুন্দর ১।১৬)

এই নৌকা কিরূপ ছিল, তাহা বরোবোদরে মন্দিরের চিত্রে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে,—হিন্দুগণ যে সকল জাহাজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন ও বিদেশে গমন করিতেন, যবদ্বীপের চিত্রপটে তাহার বহু ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। সেই জাহাজগুলি অনেকটা আধুনিক জাহাজের ন্যায়।

(৫) লঙ্কাপুরীর ধর্ম্মাধর্ম্ম।

অধর্ম্মের ত অবধিই নাই। তবে জটাযুক্ত মস্তক গোজিনাম্বর-পরিহিত রাক্ষসগণ কুশগুচ্ছ হস্তে লইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালন পূর্ব্বক তৎসম্মুখে বসিয়া তপস্যা করিতেন, লঙ্কার বর্ণনায় এরূপ উল্লিখিত আছে। (সুন্দর ৪।১৫) শেষরাত্রে উঠিয়া ষড়াঙ্গবেদবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ ব্রহ্মনাম ঘোষণাপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিতেন—এরূপ উল্লেখও দৃষ্ট হয়। (সুন্দর ১৮।২)

(৬) রাবণের নীতি।

রাবণ কুটনীতিপ্রাজ্ঞ ছিলেন। হনুমান্ তাঁহার।রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। রাবণ স্থির ধৈর্য্যসমন্বিত সুলক্ষণযুক্ত ছিলেন, তিনি রাজ্যের অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এক ধর্ম্মহীনতায় তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাব ও শক্তিতে লঙ্কাপুরী এরূপ সুদৃঢ় ও অভেদ্য ছিল যে, লঙ্কায় প্রবেশ মাত্র হনুমান্ বলিয়া উঠিয়াছিলন,—এই স্থান যেরূপ সুরক্ষিত ও প্রতাপান্বিত রাজশাসনে স্থিত, এখানে বল্কলপরিহিত রাম আসিয়াই বা কি করিবেন? (সুন্দর ২। ২৬) কিন্তু রাবণ সর্ব্বদা বাঁকা পথে চলিতেন, এবং ধর্ম্মের কথা উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার ভ্রাতা কুবেরের নিকট হইতে তিনি পুষ্পকরথ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জয়ের গর্ব্ব তিনি সীতার নিকট করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, কুবেরের ন্যায় ভ্রাতাকে পরাস্ত করিয়াছেন শুনিলে সীতাদেবীর তদীয় পরাক্রমসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। রামের বনবাসের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা এই বাহ্যসম্পদ পূজার যুগে একবারে অশ্রুতপূর্ব্ব নহে, "রাম মন্দবীর্য্য,—দশরথ প্রিয়পুত্র ভরতকে সিংহাসন দিয়া কাপুরুষকে বনে তাড়াইয়া দিয়াছেন"। (অরণ্য। ১৫)

রাবণ রামের পথে স্থিত তরুসমূহের ফল বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এরূপ আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল, এজন্য রাম স্বীয় সৈন্যদিগকে পথের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রাবণ গুপ্তচর পাঠাইয়া সুগ্রীবকে অনেক প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক রামের পক্ষ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ্যের প্রেরিত ছদ্মবেশধারী গুপ্তচরগণ প্রায়ই রামের ব্যূহসংস্থান ও অপরাপর বিষয়ের সংবাদ লইতে আগমন করিত। বিভীষণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহারা রামের পার্শ্বে আনীত হইলে দণ্ড দেওয়ার পরিবর্ত্তে রাম বলিতেন, তোমরা আমার ব্যূহসংস্থানাদি ভাল

করিয়া দেখিয়া যাও, এ বিষয়ে আমিই তোমাদিগকে সাহায্য করিব। আর যে দিন রাম-বাণ-বিদ্ধ হইয়া রাবণ পলাইবার পথ পাইতেছিলেন না,—তাঁহার কুন্তল ভ্রষ্ট ও ধনু চ্যুত হইয়াছিল তখন পরম কারুণিক রামচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, রাক্ষস তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আমি পরিশ্রান্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিব না, কাল সবল হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিও, আজ যুদ্ধ শেষ হইল। লঙ্কার সমস্ত বাহ্যসম্পদ এই উদারতার নিকট ম্লান ও বিগতমহিমা হইয়া পড়িয়াছিল—বল্কলপরিহিত রামচন্দ্রের ছবি লঙ্কার সমস্ত বৈভব ধূলি-সার করিয়া প্রতিভাত করিতেছে, বাহ্য সম্পদের ঘটা মেকি,—হৃদয়ের মধ্যে যে গুণ-গরিমা প্রচ্ছন্ন থাকে, সেই আকরের সন্ধান যিনি দিতে পারেন, তিনি মানবজাতির পরমহিতৈষী, বাল্মীকি প্রকৃত মণিকার, তিনি মেকির রাজ্যের ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া তাহার তুচ্ছতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রকৃত মণির সন্ধান দিয়াছেন। তিনি শুধু কবির মত বর্ণনা ও উপমা প্রদান করিয়া মনোরঞ্জন করেন নাই, ঋষির ন্যায় মনুষ্যজাতির গূঢ় ধর্ম্মসম্পদের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন, এজন্য অন্য কোন দেশের কবিগণের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "আজ আর বাঙালী জাতির উন্নতিসম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করিতে পারি না, কেন না বাঙালী কাঁদিতে শিখিয়াছে।" মহাপুরুষের সেই মহতী উক্তি অদ্য আমিও এই প্রবন্ধের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। কেন—তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আজ দ্বাদশ বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, এ কথা মনে করিতে পারি না। মৃত্যু জীবনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম,

"জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"

মৃতের জন্য শোক প্রকাশ অনাবশ্যক, তাহা আমরা জানি, কিন্তু আজ যে এতগুলি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান বঙ্কিমচন্দ্রের নামে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, কেন? তাঁহার গ্রথিত রত্নহার আমরা গলদেশে ধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি—ইহা কি তাহার পরিচয় নহে? তাঁহার আজীবন পরিশ্রম অদ্য যে সফলতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়, ইহাতেই আমরা হর্ষোৎফুল্ল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত যেন তাঁহার লোকান্তর গমনের পরেই রচিত না হয়। ইহারই বা কারণ কি?

মহাপুরুষেরা সর্ব্বদাই তাঁহাদের সময়ের অগ্রবর্ত্তী, তত্ত্বদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, তিনি যে বীজ বপন করিয়া চলিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনচরিত-প্রণয়ন বিড়ম্বনা

মাত্র। যখন সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবে, তখন কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না—তাহা তিনি জানিতেন। কোকিলকে কেহ বলিয়া দেয় না যে বসন্ত আসিয়াছে। কিন্তু কল্লোলিনীবক্ষ বিকম্পিত করিয়া, ভ্রষ্টশ্রী বৃক্ষরাজিকে নবপল্লবে সুশোভিত করিয়া সান্ধ্য মলয়ানিল যখন তাহাকে আলিঙ্গন করে, তখন তাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগ সে আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। নিস্তব্ধ বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া তাহার কণ্ঠ জাগিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতি তাহাকে সাড়া দেয়।

সেই শুভদিন, সেই শুভ মুহূর্ত্ত আজ আমাদের উপস্থিত। তাই আমাদের এত আনন্দ, তাই আজ এত উল্লাস। কিন্তু এই উল্লাস কেবল উল্লাসেই পর্য্যবসিত হইতে আমরা দিব না। অনুকূল বায়ু যখন প্রবাহিত হয়, তখন ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া আমোদ করিলেই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় না। পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে মাত্র সভাসমিতি করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, ইহা যদি মনে করি, তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতির অবমাননা করা হইবে, আমাদের গুরুতর প্রত্যবায়গ্রস্থ হইতে হইবে।

এখন আমরা দেখিব, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জন্য কি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমর লেখনি তিনি প্রায় সমস্ত বিষয়েই চালনা করিয়া আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। একাধারে এত শক্তির সমাবেশ কখনও শ্রবণ করা যায় নাই। তিনি আমাদিগকে কতগুলি ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাক্রমে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথম। বঙ্গভাষা—বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহার জন্ম দিয়াছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত যাহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে অতুল শোভাবিশিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থরাজি বাদ দিলে বঙ্গভাষা একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। আমরা এমন কথা বলিতেছি

না যে, আমাদের আর কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাই। সেই সমস্ত পুস্তকগুলি যে তাঁহারই পদাঙ্ক-অনুসরণে রচিত তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়। কল্পনা,—কল্পনা রাজ্যের তিনি অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলির সমালোচনা আমা অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তি দ্বারা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার হইয়া গিয়াছে এবং তাহা করিতে গেলে এই প্রবন্ধটিও দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা হইতে বিরত হইলাম। যাঁহারা উক্ত বিষয় অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে পূর্ণচন্দ্র বসুর "কাব্য সুন্দরী" ও গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "বঙ্কিমচন্দ্র" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তৃতীয়। সমালোচনা ও প্রবন্ধ—তিনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক ছিলেন, যাহার দোষ দেখিতেন, নির্ভীকচিত্তে তাহা দেখাইয়া দিতেন। আবার যথার্থ গুণ দেখিলে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাঁহার সমালোচনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার এ মতের অনুমোদন করিবেন সন্দেহ নাই।

তাঁহার মত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখক আমি আর কখনও বাংলা ভাষায় দেখি নাই। তাঁহার দ্রৌপদী-বিষয়ক প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও গবেষণার বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ। তাঁহার সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—যত দিন বাংলাভাষা থাকিবে ততদিন তাঁহার এই কীর্ত্তি অবিনশ্বর থাকিবে। এ বিষয়ে অনেকে হয় ত আপত্তি করিবেন, হয় ত তাঁহারা বলিবেন, শাঙ্কর ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর টীকা, আনন্দগিরির টীকা প্রভৃতি থাকিতে বঙ্কিম বাবুর টীকার প্রতি এত শ্রদ্ধা কেন? তাহার কারণ আছে। কারণ কি, তাহা বলিতেছি।

এই আমরা—যাঁহারা সচরাচর শিক্ষিত বাঙালী নামে অভিহিত হইয়া থাকি—সেই আমরা এক অদ্ভুত শ্রেণীর জীব। ইংরেজি পড়িয়া আমাদের

মস্তিষ্ক এমনি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, কোনও বিষয়ই ইংরাজিভাবে না বুঝাইলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ইংরাজিভাবে বোঝানটা কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব।

ইংরাজি Logic যাহাকে "ন্যায়শাস্ত্র" বলা হইয়া থাকে (যদিও ইংরাজি Logic ও সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে অনেক প্রভেদ) সেই Logicএর Reasoning অনুসারে সমস্ত বিষয় আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি, আর না পারিলে গালাগালি দিই। Logicএ যে কয় প্রকার প্রমাণের বিষয় উল্লেখ আছে, সেই কয় প্রকার প্রমাণ ছাড়া আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে অপর কয়টি প্রমাণের বিষয় উল্লেখ আছে, যথা শাব্দ, আপ্ত প্রভৃতি, যাহা আমরা অনেকেই জানি না, আর জানিলেও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই।

উল্লিখিত আমরা গীতার শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি প্রভৃতির টীকা তাই বুঝিতে পারি না—আমাদের ইংরাজি Logic অনুসারে বুঝাইলে তাহা বুঝিতে সক্ষম হই। এই বিষয়টি অতি কঠিন, একাধারে ইংরাজি ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে কেহ ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র অবলীলাক্রমে এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত গীতা আমরা যত্নসহকারে পড়িলেই বুঝিতে পারি। তাই বলিতেছিলাম, তাহার গীতার টীকা বঙ্গভাষার একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

পঞ্চম। উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত তাঁহার অপর একটী গুণ ছিল, যাহার জন্য আমরা অদ্য এখানে সমবেত। তিনি বিদ্বান্ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার যে গ্রন্থই পাঠ করুন না কেন, তাঁহার প্রবল স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাইবেন। স্বদেশকে যথার্থ মা বলিয়া ভাবিতে ও ডাকিতে একমাত্র তিনিই

পারিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকের ছত্রে ছত্রে যেন এই মাতৃভক্তি উছলিয়া উঠিতেছে। তিনি সমগ্র ভারতের ভাবটি হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিতে জানিতেন। "সমগ্র ভারত" কথাটি কেহ যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন কি? কেহ হিমালয়ের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া আলুলায়িত কেশরাশিতুল্য বনরাজির একদেশ দেখিয়াছেন। কেহ বা কুমারিকা-অন্তরীপতটে উপবিষ্ট হইয়া তুলরাশিবহনকারী, ঘোররাবী, সুনীল সিন্ধুর আন্দোলনে অন্তরে অন্তরে মন্দ আন্দোলিত হইয়া ভারতের পদনখর গণনা করিয়াছেন। কিন্তু তুমি, আমি, তিনি, আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা একদেশ মাত্র, ভারতের একটি কণা মাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই সমগ্র ভারত হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, জননীও সাড়া দিতেন।

হে বঙ্কিম! তোমার এই মাতৃভক্তি, সাধনা কখনও বিনাশ পাইবে না।

* * * "তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?"

এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবেই, আজ না হউক দু'দিন পরে হইবে। আমরা সকলে মহাপুরুষের নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণ করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলেই আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব। তখন

* * * "বিশ্বলোক ভাবিবে বিস্ময়ে
যাহার পতাকা,
অম্বর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা?"

এখন মহাপুরুষের কথাতেই বলি, হায় মা! আবার আসিবে কি—বঙ্কিমচন্দ্রের মত পুত্র আবার কি তোমার ক্রোড় আলোকিত করিয়া তেমনি করিয়া বলিবে, 'বন্দেমাতরম্'।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সৌন্দর্য্য-বিতরণ।

সৌন্দর্য্য বিল'ই আমি, কে তোরা নিবিগো আয়,
আয় আয় নিখিল মানব,
সৌন্দর্য্য বিলাই আমি শত হাতে অনুক্ষণ
রবি যথা কিরণনিকর।
আয় আয় আয় সবে হৃদয়-ভাণ্ডার ভরি'
বিতরিব এ অমূল্যধন,
আয়রে কুরূপ আয় ক'রে দিব তোরে আমি
কাম কিম্বা কুমারের মত।
"অন্তঃপুর হ'তে আয় সৌন্দর্য্যের কাঙ্গালিনী
আঁচল ভরিয়া দিব তোর,
সৌন্দর্য্যের রাজরাণী ক'রে তোরে সাজাইব
সম্ভ্রমে মোহিত হবে ধরা।—"
বসিয়া তরুর শাখে গাহিছে একটি পাখী
অবিরাম সুমধুর স্বরে,
কি সুন্দর দেহখানি বসন্ত জোছনা শুভ্র
মূর্ত্তিময়ী শান্ত পবিত্রতা।
সে স্বচ্ছ পালকগুলি ভেদি' যেন দেখা যায়
টুক্ টুক্ বুকখানি তার।
ডাকি' ডাকি' বহুক্ষণ, (কেহনা শুনিল তায়)
উড়ে' গেল আকাশের বুকে।

প্রস্তাব।

রঙ্গমঞ্চ।

সকল সভ্যসমাজেই অভিনয়ের আদর আছে—এবং সামাজিক নানা ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে ইহাও একটা প্রধান জিনিষ।

অনেক লোকের চিত্তকে যাহা আনন্দ দিতে পারে এবং সেই আনন্দ-সূত্রে সম্মিলিত করিতে পারে, তাহার একটা শক্তি আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বক্তৃতার শক্তিকে যেমন আমরা আদর করি, কারণ তাহা অনেক ভাব, অনেক চিন্তাকে বহুলোকের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে, অভিনয়কেও তেমনি একটি শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সাহিত্য অভিনয়ের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে আপনাকে প্রচার করে।

অন্যান্য আর্ট যেন নিঃসঙ্গ—অরণ্যের পুষ্পের মত নির্জ্জনে ফুটিয়া আছে। তাহাকে পড়িতে গেলে বিশেষ অভিনিবেশের দরকার। নাড়িয়া-চাড়িয়া, ঘাঁটিয়া-ঘুটিয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে হইবে। ছবি, কবিতা, গান, এ সমস্তই আলাদা-আলাদা করিয়া দেখিলে বিশেষ-ভাবে নির্জ্জনে উপভোগ্য—সজনে তাহার আসল সৌন্দর্য্যটুকু যেন প্রকাশ হইবার নয়।

এই জন্যই অভিনয়ে সমস্ত আর্টকে একত্র করিয়া তাহাদের সম্মিলিত শক্তির প্রভাব বহুলোকের উপরে বিস্তার করিবার চেষ্টা মানুষকে করিতে হইয়াছে। সুন্দর গান, সুন্দর দৃশ্য, সুললিত ছন্দ,—এ সমস্তই অভিনয়ের ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

সংসারে আমরা যখন নানা ঘটনার মধ্যে মানুষকে দেখি, তখন তাহাকে আংশিকভাবে দেখি মাত্র—নানা মানুষের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার জীবন-নাট্যের আগাগোড়াটা আমাদের নিকটে অভিব্যক্ত হয় না। কারণ, সংসারে অধিকাংশই ভাঙাচোরা জোড়াতাড়া—পরিণাম কোথাও নাই। 'Exits and entrances' আছে, কিন্তু যেখানে একের সহিত অন্য এক অপূর্ব্ব মিলনে সঙ্গত, সমস্ত ঘটনাবৈচিত্র্য, যেখানে পূর্ণ পরিণামে অবস্থিত, সেই সমাপ্তি সংসারে বিরল। এই জন্যই সাহিত্যকার নাট্য অবলম্বন করিয়া এই মানুষের প্রতিদিনের ঘটনাকে, এই অনন্ত আনাগোনাকে একটি পরিণামের মধ্যে প্রস্ফূর্ত্ত করেন—সেই পরিণাম কখনো অমৃত, কখনো গরল, কখনো ট্রাজেডি, কখনো কমেডি।

রঙ্গমঞ্চে আমরা সেই শেষ—সেই পরিপূর্ণ বাণী শুনিতে আসি। সঙ্গীত তাহারি কথা বলে, দৃশ্যরাজি তাহারই আভাস জাগাইয়া তোলে, এবং সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া তাহারি দিকে আমাদের উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। সমস্ত আর্টে মিলিয়া আমাদের চিত্তকে সেই পরিণামের জন্য উন্মুখ করিয়া রাখে।

কিন্তু সকল নাট্যে এই পরিণাম নাই। অধিকাংশ নাট্যই মাঝখানে শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন কথা নাই। তাহা কেবল আনাগোনা, সুখদুঃখের ব্যাপার। দৃশ্যের পর দৃশ্য আসিতেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য যাইতেছে,—হয় ত খুবই জাঁকালো, কিন্তু সেই দৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই সেই সকল নাট্য হইতে উদ্ধার করিবার উপায় নাই। লোকে মুগ্ধ হয়, কেহ ছবি দেখে, কেহ নাচ দেখে, কেহ গান শোনে, কেহ কোন সুন্দরী অভিনেত্রীর দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

এই প্রকার অভিনয়ে সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে। সাহিত্য যে সংসারকে পূর্ণ করিতে আসিয়াছে, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই এবং যে সাহিত্য পূর্ণ করে না, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের চঞ্চল প্রবৃত্তিকে

উত্তেজিত মাত্র করে, তাহা যে অনিষ্টকারী সে কথাও ভুলিয়া যাই। এই প্রকার অভিনয় জগতে ষোলআনা, এবং অন্যান্য লঘু আমোদের ন্যায় ইহা একপ্রকার আমোদ, সময় যাপনমাত্র।

অধুনা আমাদের দেশে এক প্রকার থিয়েটারী সাহিত্য তৈরি হইয়াছে। আলিবাবা, আবুহোসেনের দল, নিকৃষ্টতম প্রহসন—অতি নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য এবং সময়ে সময়ে কুচিবিকারেরও পরিচয় এই সকল থিয়েটার হইতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের নভেলও নাট্য করিয়া অভিনয় করা সুরু হইয়াছে। সকলেই জানেন নভেলকে নাট্য করা কত শক্ত, বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তিই তাহা পারেন, কারণ নভেলে নাটকে একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, নভেলে অনেক কথা বর্ণনায় বলা যায়, নাটকে বর্ণনার অবকাশ নাই, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানবচরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—অনাবশ্যক কোন দৃশ্য বা কোন ব্যক্তি আসিলে চলিবে না—সমস্ত নাটকটি আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ, সুগ্রথিত, ও সুপরিণত হওয়া চাই। বঙ্কিম বাবুর নভেল অনেকটা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত, তাহাতে বিস্তর শাখা-প্রশাখা ডালপালা আছে সে গুলিকে ছাঁটিয়া মূল জিনিষটা সুসংহত নাটকের আকারে কে ধরিতে পারেন, আমি তো জানি না। অথচ আমাদের থিয়েটারগুলি অবাধে তাহা করিয়া যাইতেছে।

বিলাতে থিয়েটারকে উহারা এক উচ্চ সামাজিক আমোদের মধ্যে এবং অনেক সময় শিক্ষার মধ্যে গণ্য করিয়াছে। দেশের সমস্ত ভাব ও চিন্তা থিয়েটারের মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত করিবার চেষ্টা উহারা করিয়াছে। বিলাতী থিয়েটারের সম্বন্ধে কোন কথা বলা অবশ্য ধৃষ্টতামাত্র, কারণ বিলাতের সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা-আন্দোলনের মধ্যে আমরা নাই এবং সেই উত্তেজনা-আন্দোলন কি প্রকারে নাট্যে অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে তাহাও জানি না—আমরা কেবল তাহার উপরকার সাহিত্যের খবর রাখি। কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছে

আমরা সকলে মিলিয়া যে সকল ভাবে মাতিতেছি,—কৈ, তাহাতো এপর্য্যন্ত নাট্যে ফুটিয়া উঠিয়া আমাদের সকলকে এক রঙ্গমঞ্চে আবাহন করিল না। আমাদের ইতিহাসের কোন বীরত্ব, কোন মহত্ত্ব, আমাদের সমাজের কোন যথার্থ সত্য ও সৌন্দর্য্য এপর্যান্ত আমরা নাট্যের মধ্যে পাইলাম না। উচ্চ সাহিত্যের উচ্চ অঙ্গের নাট্যের কথা ছাড়িয়া দি, দেশে যে সকল ভাব সকল মানুষকে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাঁরি কি কোন প্রকাশ রঙ্গমঞ্চ আমাদের দিবে না?

'প্রতাপাদিত্য' নাটকখানি যখন বাহির হইয়াছিল, তখন বড় আগ্রহের সহিত দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথম কয়েকটি দৃশ্যে মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, একটি বীরহৃদয়ের আশা ও কল্পনা আমাদের সকলের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু পরিণামকে এমন বিসদৃশ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? সমস্তই যেন ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিতেছে—খুড়াকে খুন করিবে—রাজ্য রসাতলে যাইবে—এ সবই যেন নিয়তির চক্র—এমনতর একটা বাহিরের জিনিষের উপরে—একটা বীরত্বের মহিমাকে ঠাঁসিয়া ধরার কি তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। তা ছাড়া গানগুলি শুনিয়াও একটু হতাশ হইতে হইয়াছিল, বীরত্বের কাহিনীতে এমন গান সন্নিবিষ্ট করা উচিত, যাহা আগাগোড়া সমস্ত নাট্যের ভিতরকার ভাবের সহিত সুর মেলায়—'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়' এ সকল গান অন্য রকমের নাটকে ভাল লাগিতে পারে, এখানে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত, ইংরাজিতে যাহাকে বলে out of place.

বর্ত্তমান সময়ে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে করি। সকলেই জানেন একটা জাতির মধ্যে জাতীয়ত্বের ভাব প্রস্ফুটিত করিতে হইলে জাতির ইতিহাসকে আশ্রয় করিতে হয়, সমস্ত লোকের কল্পনাকে সেই দিকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়। আমরা যাহা ছিলাম, তাহাই হইব—এই অনুভূতিই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় অনুভূতি। আমাদের মধ্যে

যে কত প্রকারের সম্ভাবনা আছে, আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস আমাদিগকে তাহা চোখ ফুটাইয়া দেখাইয়া দেয়। যাত্রা, কথকতা যেমন রামায়ণ, মহাভারতকে আমাদের দেশের আপামর সাধারণের নিকটে পরিচিত করিয়াছে, আমাদের দেশের ভাব ও আদর্শকে সকলের নিকট সুগম করিয়াছে, আমরা কি রঙ্গমঞ্চে তেমনি আমাদের দেশের প্রাচীন বীরগণ, কর্ম্মিগণকে দাঁড় করাইতে পারি না—তাঁহাদের ভাব ও আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার এই কি প্রকৃষ্ট পন্থা নয়?

আকবর, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ভারতের বড় বড় মহাত্মাদের ইতিহাস রঙ্গমঞ্চ হইতে আমরা দেখিতে চাই, দেশের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ এই সকল কাহিনী আমাদের নিকটে উপস্থিত করুন, এই সকল মহাত্মাদের আদর্শকে নাট্যের মধ্য হইতে উজ্জ্বল করিয়া তুলুন। আরব্য-উপন্যাস এবং প্রহসন—এ সকলের দিন চলিয়া যাইতেছে, রোমাণ্টিক অভিনয়ে আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে চরিত্রে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে, এই সকল কুৎসিত রুচি হইতে উদ্ধার করিয়া নূতন রঙ্গমঞ্চ আমাদের দেশের অন্তর্নিহিত ভাবরাশিকে নাট্য বস্তুতে গ্রথিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরুন, এই আমাদের প্রার্থনা। রঙ্গমঞ্চ একটি প্রকাণ্ড শক্তি, এই শক্তিকে সমাজের কল্যাণে লাগিতে হইবে, বিশুদ্ধ সাহিত্যের আমোদ যখন সঞ্চার করা দুরূহ, তখন অন্ততঃ প্রয়োজনহিসাবে রঙ্গমঞ্চকে এই নূতন ভাবের পথে যাইতে হইবে। ছোট-বড়, পণ্ডিত-মূর্খ সকলে মিলিয়া এই একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। রঙ্গমঞ্চের সেই নূতন জন্মদিনের অপেক্ষায় আমরা রহিলাম।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন।

সম্প্রতি দেশে হিন্দুমুসলমানে যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের উপায় কি ?

উত্তর।

উত্তর ১। শ্রীযুক্ত মৌলবী সিরাজুল ইসলাম।

বঙ্গদেশে হিন্দুমুসলমান মধ্যে অধুনা যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার মতামত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি ইহা কতদূর ফলদায়ক হইবে তাহার বিশেষ আশা করিতে পারি না, কিন্তু তদ্দারা যদি অনুমাত্রও প্রতিকার হয়, তাহা হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

হিন্দুমুসলমান এদেশে স্মরণাতীত কাল হইতে একত্রে প্রণয়ভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে, ইহারা এক মাতার দুই সন্তান, একের সুখে অন্য সুখী এবং একের দুঃখে অন্য দুঃখী। হিন্দুর ভালমন্দে মুসলমানের ভালমন্দ, উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ এক, একের অনিষ্ট হইলে অপরের অনিষ্ট নিশ্চয়ই হইবে, কত বিবিধ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। যখন হিন্দুমুসলমানের একদেশে জন্ম ও একই দেশে বাস এবং প্রতিমুহূর্ত্তে যাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রণয় থাকা অতি আবশ্যক। মহাত্মা সার সৈয়দ আহম্মদ বলিয়াছেন, "হিন্দু-

মুসলমান ভারতমাতার দুই চক্ষু, ইহার একটিতে আঘাত লাগিলে অপরটিও আঘাত পাইবে"। এ অবস্থায় এই দুই সম্প্রদায় মধ্যে বিরোধ বা অনৈক্য হইলে উভয়ের সমূহ ক্ষতির কারণ ও দেশের প্রভূত অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিষম বিপ্লব ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহা শুনিয়া আমি নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি। স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল হিন্দুমুসলমান মাত্রই অতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়াছেন ও তাঁহাদের অন্তর ব্যথিত ও আহত হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায় মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য ও কলহ থাকা পরস্পরের অত্যন্ত অহিতকর ও দেশের মহাদুর্ভাগ্যের বিষয়। ভ্রাতৃকলহে যেরূপ গৃহের সর্ব্বনাশ হয়, সেইরূপ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এইরূপ বিরোধ দেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, কোন ব্যক্তিই, হিন্দু কি মুসলমান, জমীদার কি প্রজা, ধনাঢ্য কি দরিদ্র, কেহই সুখ শান্তিতে নিশ্চিন্তে জীবন ধারণ করিতে পারিবে না, সদা সকলকে প্রাণভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হইবে।

এখন এই আকস্মিক সংঘর্ষণের প্রতিকার কি? কি উপায়ে এই হতভাগিনী ভারতজননীর সন্তানগণের আন্তরিক বৈষম্য নিবারিত ও বাহ্যিক বিবাদ নির্য্যাতন করা যায়? আমার বিবেচনায় ইহার প্রতিকার অতি সহজ, তজ্জন্য সমরসজ্জার কোন প্রয়োজন নাই;—আমরা হিন্দুমুসলমান যে এক মাতার দুই সন্তান, আমরা এক দেশবাসী, আমাদের স্বার্থ একই, একের উপকারে অন্যের উপকার ও একের অনিষ্টে অন্যের অনিষ্ট, এই কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা সকলে কার্য্য করি, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বিরোধের কোন কারণ উদ্ভব হইবে না, শান্তি ও সদ্ভাব চিরকাল বিরাজ করিবে, ও ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত ও বদ্ধমূল হইবে!

কোন কোন রাজনৈতিক কি সাম্প্রদায়িক বিষয়ে মতামতের অনৈক্য কি ব্যক্তিগত মতান্তর থাকিলেও তজ্জন্য পরস্পরকে শত্রুজ্ঞান করা উচিত নহে। মতামতের বিভিন্নতা প্রযুক্ত পরস্পরের সামাজিক ও স্বদেশবাসী সম্পর্কের মূলচ্ছেদন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিরুদ্ধ-মতের সম্প্রদায়ের প্রতি কোন প্রকারের অত্যাচার কি বল প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

উপরোক্ত বিষয় কয়টি আপামর সাধারণ মধ্যে প্রচারিত হইলে ও তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলেই তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, এবং এই ঘোরতর বিবাদ-বিসম্বাদ ক্রমে হ্রাস পাইবে, ও কুমতি-প্রচালিত গত দুষ্কৃতির জন্য পরিতাপ করতঃ ভ্রাতৃভাবে একে অন্যকে আলিঙ্গন করিবে।

আমার বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের গণ্য মান্য ব্যক্তি ও নেতাগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা একত্রিত হইয়া প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে ও সবডিভিসনে ও প্রধান প্রধান স্থানে এক একটি কমিটি স্থাপন করেন, ঐ কমিটিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই নেতাগণ মেম্বর থাকিবেন, তাঁহারা একমত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিলেই এই সংঘাতের প্রতিকার শীঘ্র ও সহজে হইবার সম্ভব।

মুসলমাননেতাগণের পক্ষে উচিত যে, তাঁহারা সাধারণ মুসলমানগণকে এই কয়েকটি বিষয় ভালরূপ বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। উভয়ের মধ্যে বিবাদ উভয়েরই অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণ এবং দেশের অমঙ্গল। গুণ্ডাদিগের কার্য্যে তাঁহাদের কোন সহানুভূতি নাই এবং ঐ প্রকার দুষ্কার্য্য কেহ করিলে তাহার প্রতিবিধান করিতে সকলেই প্রস্তুত থাকিবেন। ঐ প্রকার হিন্দুনেতাগণেরও কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতি হিন্দুগণকে এই কয়েকটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করান যেন তাহারা প্রকাশ্যে কোন কার্য্যে মুসলমানগণকে হেয় জ্ঞান

না করেন ও শত্রু চক্ষে না দেখেন। রাজনৈতিক কোন বিষয়ে মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত বিভিন্নতা থাকিলেও তৎপ্রযুক্ত তাহাদের উপর কোন প্রকারের অযথা বলপ্রকাশ কি অত্যাচার করা উচিত নয়।

কোন সম্প্রদায়ের কোন লোক কোন প্রকারের অমানুষিক কার্য্য করিলে সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আমার মতে আমাদের হিন্দুভ্রাতাদিগের একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাঁহাদের ব্যবহারে ও কার্য্যে মুসলমান এমন বিবেচনা না করেন যে, তাহাদের স্বার্থের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টি ও মনোযোগ নাই। এই ধারণাটি যাহাতে মুসলমানদিগের অন্তর হইতে দূরীভূত হয় তৎপ্রতি আমাদের হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণ সচেষ্ট ও যত্নবান হইবেন, তাহা হইলেই আমাদের আশা সফল হইবে ও ভারতভূমিতে চিরশান্তি বিরাজ করিবে।

উপসংহার কালে আমার একটি বক্তব্য এই যে, আমাদের সকলের রাজার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। রাজভক্ত হওয়া হিন্দু কি মুসলমান উভয় জাতিরই শাস্ত্রানুমোদিত। রাজ-প্রণীত আইন কি বিধান প্রতিপালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত।

উত্তর ২। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ।

আমরা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, হিন্দুমুসলমান মধ্যে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া ক্রমে উভয় জাতির একতা বৃদ্ধি করিব; কিন্তু এখন ঢাকার নবাব ও তার কতিপয় মুসলমানদের ব্যবহারে শীঘ্র প্রীতিস্থাপন একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই দুই জাতি মধ্যে শীঘ্র যে সদ্ভাব জন্মে এমন আশা অতি কম। আমরা যতই আপন জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিতে চাই, তাহারা সরলভাবে তাহা গ্রহণ করিতেছে না। দুর্ব্বৃত্ত এবং গুণ্ডাসমুলমানদিগকে শাস্তিবিধান ব্যতীত তাহাদের অমানুষিক

ব্যবহারের প্রতিকার কিছুই দেখিতে পাই না। শাস্তি প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দুষ্কার্য্যের পরিণাম ফল বুঝিতে পারিয়া আমাদের সঙ্গে পুনঃ সদ্ভাব স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে এবং সে সময় উভয় সম্প্রদায় মধ্যে একতা সংস্থাপনের আশা করা যায়।

এ জেলার স্থানে স্থানে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি ভগ্ন, হিন্দুরমণীর প্রতি পশু অপেক্ষাও পাষণ্ডের অত্যাচার, প্রতিদিন হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি যে সকল অত্যাচার হইতেছে তাহাতে দুর্ব্বৃত্তগণের দণ্ড না হওয়া পর্য্যন্ত প্রীতি স্থাপনের প্রস্তাব শ্রুতিকটু বোধ হইতেছে। সকলের মনের অবস্থা স্বাভাবিক হইলে, এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সময় হইবে। উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব এবং একতা স্থাপন ব্যতীত যে এদেশের কল্যাণ নাই এ কথা সকলেই অনুভব করেন, কিন্তু এখন তাহা আলোচনার সময় নহে।

শিল্প-বাণিজ্য।

প্রদর্শনীর সার্থকতা।

আমাদের দেশে আজ কাল নানা স্থানে শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনীর অধিবেশন হইতেছে। বস্তুতঃ বলিতে গেলে এমন কি এতদ্দেশে প্রদর্শনীর যেন একটা প্রবল বন্যা আসিয়াছে। অবশ্য এই সময় প্রদর্শনী যে কিয়ৎ পরিমাণে দেশীয় জনসাধারণের উদ্যম ও দেশোন্নতির আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল কার্য্যের ন্যায় দ্রব্যাদি প্রদর্শনেরও একটা শৃঙ্খলা ও নিয়ম আছে। অসম্বদ্ধভাবে সজ্জিত দ্রব্যরাশিকে প্রদর্শনী বলা যায় না। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে প্রদর্শনীর বাহুল্য হইলেও লোকশিক্ষার উপযুক্ত প্রদর্শনীর অধিবেশন কম হইয়াছে। কিন্তু বিগত কলিকাতা প্রদর্শনী অনেকাংশে প্রদর্শনীর আদর্শ পূরণ করিয়াছিল। সম্প্রতি আমাদের সহযোগী "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইণ্ডিয়ার" কার্য্যালয় হইতে উক্ত প্রদর্শনীর একটী বিবরণী বাহির হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত বিবরণীর সমালোচনাদ্বারা প্রদর্শনীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই হয়ত স্মরণ আছে যে, ১৮৮৩-৮৪ সালে কলিকাতায় একটি বিরাট আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর অধিবেশন হয়। উহার পূর্ব্বে এতদ্দেশে দুই-একটি ছোট-খাট প্রদর্শনী হইলেও উহার ন্যায় বৃহৎ প্রদর্শনী আর এতদ্দেশে হয় নাই। আয়তনের হিসাবে উহা তিন লক্ষ বর্গফুট অধিকার করিয়াছিল এবং প্রদর্শিত দ্রব্যাদির সংখ্যাও প্রায় এক লক্ষ হইয়াছিল। ২৫০০ প্রদর্শক এই প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রেরণ করে।

উক্ত আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীই ভারতবর্ষের অতুল কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শন করিয়া বিদেশীয় বণিকের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। উক্ত প্রদর্শনীর দ্বারা আমাদের উপকার এবং অপকার উভয়ই হইয়াছে। উপকার এই যে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া দেশীয় কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ এবং উহাদের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ Reporter on Economic Products এর কার্য্যালয় এবং Indian Museumএর Economic Section এর উল্লেখ করিতে পারা যায়। এতদুভয়েরই সৃষ্টি আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর পর হইয়াছিল। অবশ্য প্রদর্শনীর জন্যই যে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। হয় ত প্রদর্শনী না হইলেও উক্ত দুইটি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যালয় স্থাপিত হইত। কিন্তু প্রদর্শনী আমাদের শাসনকর্ত্তাগণকে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের অবস্থা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। প্রদর্শনীতে আমাদের যে সমুদয় অপকার সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্যতম এই যে বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের অভাব ও অভিরুচি বুঝিতে পারিয়া আমাদের কতিপয় শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আমাদের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। সে সমস্ত শিল্পের উল্লেখ বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমালোচনার বহির্ভূত।

কলিকাতা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী আমাদের দেশে বিদেশীয় প্রথায় প্রদর্শনী করার পথ প্রথম প্রদর্শন করে। আমরা বিদেশীয় প্রথা বলিতেছি, কারণ এই যে, দেশীয় প্রথার প্রদর্শনী অনেক দিবস হইতেই এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে পূর্ব্বে যে সমস্ত বিরাট মেলার অধিবেশন হইত তৎসমুদয় প্রদর্শনী ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্দ্বারা দেশীয় জনসাধারণের দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির সম্বন্ধে যে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানলাভ হইত না তাহাও নহে। কিন্তু মেলাসমূহে দ্রব্যাদি

প্রদর্শনের একটা শৃঙ্খলা ছিল না এবং কোন শিল্পজাত দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালীও প্রদর্শিত হইত না। অধিকন্তু মেলাসমূহ সাধারণতঃ আমোদ-প্রমোদের স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, ঐ সমুদয় মেলা যে দেশীয় শিল্পের অবস্থার পরিচায়ক এবং সেই হিসাবে বিশেষ মনোযোগের সহিত দ্রষ্টব্য, তাহা অনেকেরই ধারণা হইত না। বর্ত্তমান সময়েও প্রদর্শনীর গুরুতা যে বিশেষ উপলব্ধ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রদর্শনীসমূহ যে অধিক পরিমাণে সাধারণের দ্বারা আদৃত হইতেছে এবং দেশীয় শিল্পাদির সংক্ষিপ্তসাররূপে পরিগণিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নাই।

যাহা হউক কলিকাতা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর পর হইতেই আমাদের দেশে মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর অধিবেশন হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতার 'ভারতীয় শিল্প সমিতি' (Indian Industrial Association) কাশীপুর, মোহনবাগান প্রভৃতি স্থানে কয়েক বৎসর ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর অধিবেশন করান। আমাদের পাঠকবর্গের অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে যে, উক্ত প্রদর্শনীসমূহে ভারতবর্ষের নানাস্থানজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং বহুসংখ্যক লোকে প্রদর্শনী দর্শন করিতে যাইতেন। জাতীয় মহাসমিতি পূর্ব্বে কৃষিশিল্পাদির উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেন না। কিন্তু তাহারা ক্রমশ বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল রাজনীতির বাগবিতণ্ডায় জীর্ণ ভারতের দেহে বল সঞ্চার হইবে না। দেশকে সবল করিতে হইলে দেশীয় কৃষি-শিল্পাদির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যখন মহাসমিতির কর্ত্তাগণ এই ধ্রুব সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখনই তাঁহাদের দেশীয় কৃষিশিল্পোন্নতির বাসনা বলবতী হইল। অধিকন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, যদি ভারতবর্ষের নানাস্থানজাত দ্রব্যাদির একত্র সম্মিলন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং চিন্তাবিনিময়ে শিল্পের

উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভবপর। এই সমুদয় বিষয় গবেষণাপূর্ব্বক তাঁহারা ১৯০১ সালে কলিকাতায় প্রথম জাতীয় মহাসমিতিসংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীর অধিবেশন করান। তৎপরে যে যে স্থানে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছে সেই সেই স্থানে প্রদর্শনীরও অধিবেশন হইয়াছে। কলিকাতার পর আহম্মদাবাদ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং কাশীতে যথাক্রমে প্রদর্শনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিগত প্রদর্শনীকে জাতীয় মহাসমিতির ষষ্ঠ প্রদর্শনী বলিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শনীর সাধারণ বিভাগসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির বিজ্ঞানাদির সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা বিগত প্রদর্শনী হইতে কি কি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছি, তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ করিতে হইলে প্রথমতঃ বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ করিতে হয়। দেশীয় জনসাধারণের উত্তমদ্বারা বস্ত্রশিল্পের যে কতদূর উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা প্রদর্শনীর প্রত্যেক চিন্তাশীল দর্শক মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সরকারি বাৎসরিক বাণিজ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আজ কাল মোটা সূতার কাপড়ের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আজ কাল যে বিলাতী কাপড় আমদানি হয় তাহার অধিকাংশই সরু সূতার কাপড়। প্রদর্শনীতে কৃষ্ণা স্বদেশী মিল প্রভৃতি কতিপয় মিল যে সূক্ষ্ম সূতার কাপড় প্রদর্শন করিয়াছিলেন তদ্বারা আশা করিতে পারা যায় যে, কাল ক্রমে সরু সূতার কাপড়ের আমদানিও কমিয়া যাইবে। রেশম ও পশমজাত দ্রব্যাদির বাজারও এক সময় বিদেশীর পণ্য দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। এক্ষণে কিন্তু দেশীয় শিল্পের পুনরুত্থানে বিদেশীয় দ্রব্যাদিকে অনেক পরিমাণে পশ্চাৎ গমন করিতে হইয়াছে। সাধারণ বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের ব্যবসায়িগণ অনেক পরিমাণে দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ দ্রব্যাদি

প্রস্তুত করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সামর্থ্য আমাদের দেশের লোকের নাই। মধ্যম প্রকারের দ্রব্যই এতদ্দেশে সমধিক পরিমাণে প্রচলিত হইতে পারে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জর্মনি ইহা বুঝিতে পারিয়া সস্তা দরে মোজা, গেঞ্জি, চাদর, কলাই করা বাসন, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি এতদ্দেশে বিক্রয় করিতেছে। আমাদের কোন কোন ব্যবসায়ীর ধারণা যে, উচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত করাই ভাল। ইহা সকল সময় সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। প্রদর্শনীতে যে সমুদায় দ্রব্যাদির অধিক বিক্রয় হইয়াছিল, তৎসমুদায় মধ্যম প্রকারের দ্রব্য। আমরা তজ্জন্যই মধ্যম প্রকারের দ্রব্যের পক্ষপাতী।

বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্রশিল্পের উপর সাধারণের যে বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হস্তপরিচালিত তাঁতসমূহের সমষ্টি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নানাস্থান হইতে প্রেরিত তাঁত একস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বস্ত্র ব্যবসায়িগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা তাহাদের গুণাগুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা কারতে পারিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দ্রব্যাদিপ্রস্তুতপ্রণালী প্রদর্শন বর্ত্তমান কালের প্রদর্শনী-সমূহের অন্যতম সুলক্ষণ। বিগত প্রদর্শনীতে নানাবিধ বস্ত্রবয়নের তাঁত, রেশম ও কার্পেট বুনিবার কল ব্যতীত সাবান, চিনি, চামড়া প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা আজ কাল অনেকেই নিত্য সাবান ব্যবহার করিয়া থাকি, দোকানে নানাবিধ প্রকারের সাবান সজ্জিত থাকিলেও তাহাতে আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যদি কোন স্থানে সাবানপ্রস্তুতপ্রণালী প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে স্বতঃই আমরা উহা মনোযোগের সহিত দর্শন করি। অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। যে সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ আমাদের দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাই, প্রদর্শনের প্রকারভেদে ঐ সমস্ত দ্রব্যই আবার আমরা আগ্রহের সহিত বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য

যদি লোক শিক্ষা হয় তাহা হইলে দ্রব্যাদি প্রস্তুতপ্রণালী যত অধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হইবে, তত প্রদর্শনী অধিক কার্য্যকরী হইবে।

বিবরণীভুক্ত প্রদর্শিত দ্রব্যাদি ও পুরস্কারের তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এতদ্দেশে বড় ব্যবসায়সমূহের উপর এখনও তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পেটেণ্ট ঔষধ, সুগন্ধি তৈল, কালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সামান্য দ্রব্যাদিরই কিছু বাড়াবাড়ি। অবশ্য আমাদের দেশের লোকের অর্থাভাবও বেশী এবং তজ্জন্য কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার উপায়ও কম। কিন্তু অপরাপর বিষয়ের ন্যায় শিল্পাদিসম্বন্ধেও সাহস করিয়া বড় কাজে হাত না দিলে কিছু হয় না। শিল্পাদির উন্নতির জন্য রাসায়নিক ও লৌহদ্রব্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদর্শনীতে দুই একটি প্রদর্শক ব্যতীত কেহ উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক কিম্বা লৌহদ্রব্যাদি প্রদর্শন করেন নাই। পক্ষান্তরে বিদেশীয় ব্যবসায়িগণ যে সমস্ত লৌহজাত কল, কব্জা প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যে, বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিদেশীয় বণিকের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে গেলে আমাদিগকে তাঁহাদেরই উদ্ভাবিত কল, কব্জা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা জীবনসংগ্রামে উপযুক্তেরই জয় হইবে।

আমরা এ পর্য্যন্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের দুইটি মণ্ডপে যে সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় যিনিই মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের কৃষি ও অরণ্যজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে এখনও কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই। বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ সার জোসেফ হুকার বলিয়াছেন যে, উদ্ভিদসমূহের উপচিত্রে এবং প্রাচুর্য্যে জগতের কোন দেশই ভারতবর্ষের সমকক্ষ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়

এত উদ্ভিদের মধ্যে আমরা কেবল দুই চারিটিকেই কাজে লাগাইতে শিখিয়াছি। অবশিষ্ট বিপুলসংখ্যক উদ্ভিদের মধ্যে যে কি অসীম ধন সঞ্চিত আছে, তাহা কে বলিতে পারে। আমাদের খনিজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সাধারণের সামান্য জ্ঞানই আছে। সুতরাং উক্ত দ্রব্যাদি যত অধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হয় ততই ভাল।

আমরা প্রদর্শনীর বিবরণী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বহিখানিতে প্রদর্শনীর কর্ত্তাগণের ও বিশেষ বিশেষ স্থানের কয়েকটি সুন্দর হাফ্‌টোন প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ জে চৌধুরীর প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ও বন্ধকালীন বক্তৃতায় প্রদর্শনীর ইতিহাস অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বর্ত্তমান লেখক প্রণীত Calcutta Exhibition' ও 'Concluding Remark' নামক দুইটি অধ্যায়ে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রদর্শিত দ্রব্যাদির ও পুরস্কারের তালিকা প্রত্যেক দেশীয় শিল্পানুরাগী ব্যক্তির পাঠযোগ্য। ইহা হইতে দেশের কোন্‌ স্থানে কি প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং শিল্পবাণিজ্যের গতি কোন দিকে চলিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ এই বিবরণী সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রকাশক একটি বিশেষ দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। যদি আমরা প্রদর্শনী হইতে কোন শিক্ষালাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছি কৃষি-শিল্পের উন্নতিই আমাদের ভবিষ্যত আশা এবং উক্ত উন্নতিসাধনকার্য্যে ব্রতী হওয়াই আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

জীবনী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করা ব্যতীত এই অভিশপ্ত দেশের নিষ্কৃতির উপায় নাই স্থির জানিয়া, তাহার প্রচলনে যিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এত-বড় বিরাট শিল্পপ্রদর্শনী যাঁহার কৃতিত্বে ইংরেজদের মনে বিস্ময় জন্মাইয়া সফলতা লাভ করিয়াছে, দেশের কাজে ও মঙ্গল-চিন্তায় যাঁহার দেহমনপ্রাণ সমর্পিত হইয়াছে, যাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও দেশের কল্যাণে ত্যাগস্বীকার দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছি, আজ আমরা সেই মাননীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিব।

পাবনা জিলার অন্তগত হরিপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। এই জমিদার বংশ হইতেই নাটোর রাজবংশের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান্ রামদেব চৌধুরী নবাব্ মুর্সিদকুলিখাঁয়ের রাজত্বকালে বিশেষ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতৃকুলও 'বাগের রায়" বলিয়া খ্যাত; এবং এই বংশেরই পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান রাজত্বকালে রাজকীয় বিভাগে বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রতিভা বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন।

ইঁহার পিতা ৺দুর্গাদাস চৌধুরী সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার ডি, এল, রিচার্ডসনের প্রিয় শিষ্য ও হিন্দুকলেজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

তখন বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু তখনকার ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ছিলেন। কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। মাননীয় যোগেশচন্দ্র ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট্ স্কুলে ইহাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছুদিনের জন্য Metropolitan Collegeএ রসায়ন ও বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ইনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত বিলাত যাত্রা করিলেন। Oxfordর New Collegeএ বিজ্ঞান ও বিশেষভাবে আইন অধ্যয়ন করিয়া France ও Scotlandএর প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করেন। যোগেশচন্দ্র অদম্য উৎসাহ ও অধ্যয়নের বলে অক্সফোর্ডে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া জন্মভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল ব্যারিষ্টারি করিয়া তিনি Calcutta Weekly Notes নামে একখানি আইন বিষয়ক সংবাদপত্র প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষে আইন বিষয়ক এই একমাত্র সংবাদপত্র যাহা যোগেশচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা তাহাকে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বদ্ধ না করিয়া ইহাঁকে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে তাহার অদম্য উৎসাহ ও মনোযোগ দৃষ্ট হইত। তাঁহারই প্রযত্নে ও চেষ্টায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির সহিত কলিকাতায় শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী হয়। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে আহম্মদাবাদ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং বারাণসীতে উক্ত প্রদর্শনী জাতীয় মহাসমিতির সহিত চলিয়া আসিতেছে। যোগেশচন্দ্র "ইণ্ডিয়ান ষ্টোর" নামক যৌথ কারবারের একজন প্রবর্ত্তক।

স্বদেশজাত দ্রব্য সংগ্রহ এবং বিক্রয়ই এই ষ্টোরের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজসাহী বিভাগ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। আমরা যোগেশচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীকেদারনাথ দাসগুপ্ত।

আবুপাহাড় ও দেলবারামন্দির।

আবুপাহাড় রাজপুতানার অন্তর্গত সিরোহী রাজ্যে (১) অবস্থিত। এই পাহাড় হিন্দু ও জৈনদিগের তীর্থস্থান। ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া ‘বনাশ’ নদী প্রবাহিত। ইহার উপর গভর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট সাহেবের বা আজমীরের চীফ কমিশনরের সদর আফিষ। গ্রীষ্মকালে রাজপুতানার অনেকানেক রাজন্যবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ শৈলাবাসে এখানে আসিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এই পাহাড়ে উঠিবার পথ অতিশয় কষ্টকর ও দুর্গম ছিল। পশু বা শকটাদিযোগে যাওয়া যাইত না। পায়ে হাঁটিয়া ভিন্ন যাওয়ার উপায় ছিল না। পরে আনাদ্রা হইতে পথ প্রস্তুত হয় তাহাতে ঘোটকাদি উঠিতে পারে। এক্ষণে কয়েক বৎসর হইল রাজপুতানা-মালব রেলপথের আবুরোড ষ্টেশন হইতে পাকা রাস্তা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৭ মাইল। ডাক টঙ্গাগাড়ীতে ৩ ঘণ্টায় আবুতে যাওয়া যায়। যদিও আবু বাদ দিয়া সিরোহী রাজ্যের গড় বৃষ্টিপাত ২২ ইঞ্চির অধিক নহে, কিন্তু আবুপাহাড়ের বৃষ্টিপাত ৬৮ ইঞ্চি বা কলিকাতার সমান।

গুরুশিখর আবুপাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর। ঐ শিখর হিমালয় ও নীলগিরির মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ স্থান এবং ভারতের বৃহৎ ত্রিকোণমিতি সম্পর্কীয় জরীপের একটি কোণ। এখানে মহাদেবের একটি মন্দির আছে, তথায় গুহাবাসী ২।৪ জন সাধুসন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখানে বায়ুর এত প্রভাব যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর। এখানে সূর্য্যাস্ত দর্শন করিবার একটি স্থান আছে, তথা হইতে সূর্য্যদেবকে অস্তাচলে গমন

---

(১) সিরোহী রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পর সংখ্যায় দিব ইচ্ছা রহিল।

করিতে দেখিলে পরমেশ্বরের অনন্তলীলার মাধুর্য্যে কেমন তন্ময় হইয়া যাইতে হয়।

আবুপাহাড়ের উপর জৈনদিগের দেলবারা মন্দির অবস্থিত। দেলবারার সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের মনোরম্য কারুকার্য্যখচিত বড় বড় থামযুক্ত একটি নাটমন্দির বর্ত্তমান। তাহার উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চাদ্ভাগে সমশ্রেণীযুক্ত পরস্পর সংশ্লিষ্ট অথচ চূড়াবিশিষ্ট ছোট ছোট অনেকগুলি মন্দির বিরাজিত এবং প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখেই ভিন্ন ভিন্ন কারুকার্য্যখচিত থাম ও গম্বুজ-বিশিষ্ট এক একটি নাটমন্দির বিদ্যমান। অথচ প্রতি মন্দিরেই নেমিনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত এক একটি নাথমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। ঐ নাটমন্দিরসহ শ্রেণীবদ্ধ মন্দিরের সমষ্টিই দেলবারা মন্দির নামে অভিহিত। বাহির হইতে দেখিলে ইহার কোনও আড়ম্বর বোধ হয় না; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে অবাক্ হইতে হয়। এই মন্দিরের শিল্পগুলি বর্ণনাতীত, স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার যথার্থ ধারণা হইতে পারে না। চন্দ্রাবতী নামক সমৃদ্ধিশালী পুরাতন হিন্দুরাজ্যের বিখ্যাত ধনী সওদাগরদ্বয় বিমল সাহ ও তেজপাল এই মন্দিরের স্থাপনকর্ত্তা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎকালে আবুপাহাড় দুরারোহ ছিল, কোনও প্রকার গাড়ী ঘোড়া উঠিবার পথ ছিল না। এবং আবুপাহাড়ে শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর পাওয়া যাইত না; সুতরাং অন্যত্র হইতে এই মন্দিরের উপাদানগুলি সংগ্রহ করা যে কি অপরিমিত ব্যয়সাধ্য তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত কারণ বর্ত্তমান থাকায় মন্দির প্রতিষ্ঠা বহুশ্রম বা বহু কষ্টসাধ্য হইলেও এবং ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী আবুদেশের রাজার স্বরাজ্যে জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠায় অমত সত্ত্বেও তাঁহাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া পররাজ্যে কেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার নিগূঢ় কারণ এইটুকু পাওয়া যায় যে, অত্যুচ্চ দৃঢ়তর পর্ব্বতভূমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে বিঘ্নসমূহ উপেক্ষা করিয়া কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ মন্দিরটি চিরস্মরণীয়রূপে প্রতিভাত হইবে, ইহা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন।

কিন্তু জানিনা কোন যুক্তিতে সমুদ্রের অনতিদূরবর্ত্তী নিম্নভূমিতে স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপে "ভিক্টোরিয়া মিমোরিয়াল হল্"টি প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল।

এই মন্দির সম্বন্ধে একটি সত্য প্রবাদ এই যে, মন্দিরের জন্য ভূমি টাকার দ্বারা আবৃত করিয়া তদ্বারা স্থান ক্রয় করা হয়। আগরার তাজমহল পৃথিবীর মধ্যে আশ্চর্য্য বলিয়া কথিত হয়. কিন্তু দেলবারামন্দির অনেক বিষয়ে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। তাজের সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠব আছে, তাজ দেখিলে হৃদয়ে একটা গভীর ভাবের উদয় হয়, কিন্তু দেলবারা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আবার যদি ভাবা যায়, তাজমহল দিল্লীর বাদসাহদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী শাহ-জাহানের প্রিয়তমা প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত, আর দেলবারামন্দির বিমল সাহ নামক ধনী সওদাগরের পুণ্যকর্ম্মোপলক্ষে স্থাপিত। একদিকে অসীম ক্ষমতা, আজ্ঞাতে দেশ দেশান্তর হইতে কারিকর ও দ্রব্যাদি আসিয়াছে। আর একদিকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিল্পী আনয়ন ও দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইয়াছে। তাহা হইলে দেলবারা আরও চমৎকার বলিয়া মনে হয়। তথায় শ্বেতপ্রস্তরের প্রায় চারিহাত উচ্চ এক একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত কয়েকটি হস্তী আছে ; তাহার উপর সওয়ার ছিল: কিন্তু মুসলমান সৈন্যগণ সে সব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বিমল সাহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের প্রস্তরমূর্ত্তি মন্দিরসম্মুখে বিদ্যমান আছে।

আবুপাহাড়ের গাত্রে প্রায় ৭০০ উচ্চনীচ অপরিষ্কার সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিলে পর্ব্বত-গাত্রে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত গোমুখ নামক একটি ঝরণা দেখা যায়, ঐ ঝরণা হইতে অবিরাম স্বচ্ছজলপাত হইয়া থাকে। কিন্তু কোথা হইতে ঐ জল আইসে তাহা জানা যায় না। ইহার সন্নিকটে বশিষ্টাশ্রম নামক একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরে ভগবান্ বশিষ্ট-দেবের একটি কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। বাহিরে বশিষ্টদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে করজোড়ে অতি সুন্দর একটি ধাতুমূর্ত্তিও আছে। ইহা প্রমরবংশীয়

কোন রাজার, এই প্রকার সকলে বলে। স্থানটি অতি সুন্দর। সোপানাবলী অবতরণ ও আরোহণে বিশেষ কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তথাকার স্নিগ্ধ সমীরণে সব কষ্ট দূর হয়। ইহার নিকটে একটা পর্ব্বতের শিরোভাগে গুহারূপ মন্দির, ভিতরে অধরদেবীর অবস্থান। লোকে বলে অধরদেবী শূন্যে ঝুলিতেছেন। প্রদীপের অল্প আলোকে বিশেষ বুঝিতে পারা যায় না।

আবুপাহাড়ে লক্ষ্মীতলাও নামক একটি হ্রদ আছে। ইহার দৃশ্য অতীব মনোহর। সিরোহী রাজ্যের অন্য কোথায়ও মাছ পাওয়া যায় না, অথচ ইহা মৎস্যপরিপূর্ণ। ইহার চতুষ্পার্শ্বে রাজপুতানার রাজন্যবর্গের গ্রীষ্মাবাস। তন্মধ্যে জয়পুরের মহারাজার প্রাসাদই সর্ব্বোচ্চ। ইহার নিকটে একটি পোলো খেলিবার স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহার খরচ প্রায় এক লক্ষ টাকা, দেশীয় রাজাদের চাঁদাতেই ঐ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। একমাত্র উদয়পুরের মহারাণার বাসস্থান এখানে নাই এবং পোলো খেলার চাঁদাও তিনি দেন নাই।

আবু কোতোয়ালী হইতে ৭৷৮ মাইল দূরে অচলগড় দুর্গ অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন। একটি খোদিত লেখা দৃষ্টে জানা যায় যে, ধরপ্রমর-নামক তৎকালীন রাজা ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন, তারিখ সম্বৎ ১২৬৫ বা ১২০৯ খৃষ্টাব্দ। মোগল সম্রাটের সৈন্য দ্বারা পরাজিত এবং পলায়নপর চিতোরের রাণা কুম্ভজীকে সিরোহীরাজ অচলগড়দুর্গে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। পরে কুম্ভজী ঐ নিরাপদ ও অগম্য আবুদুর্গ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সিরোহীরাজ কৌশলে ও বলে তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেন এবং আবুর উপর কোন রাজার যাইবার পথ এককালীন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বন্ধ করেন। পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ হুকুম রদ হইয়াছে। গভর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট সাহেবের এবং ব্রিটিশসৈন্যের ঐ প্রদেশে সদর আফিস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজপুতানার রাজন্যবর্গও অব্যাহতভাবে তথায় যাইয়া থাকেন।

অচলগড়ের জৈনমন্দিরগুলিও অতি পুরাতন এবং দেলবারা-মন্দিরের সমসাময়িক এবং আবুর উত্তর-পূর্ব্বকোণে একটি উচ্চ চূড়ার উপর অবস্থিত। উহা নিম্নস্থ সমতল ভূমি হইতে অতি সুন্দর ছবিখানির মত দেখায়। উহার অভ্যন্তরে কতকগুলি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। তাহা কারুকার্য্যের ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত, মন্দিরের সম্মুখভাগে 'শ্রাবণ' ও 'ভাদ্রব' নামে দুইটী তলাও বা ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়গুলি সবিশেষ জানিতে হইলে মহামতি সুলেখক টড্ সাহেবের "Travels in Western India" নামক পুস্তকখানি পাঠ করা আবশ্যক।

আবু হিন্দুদিগের মহাতীর্থ ও পবিত্র স্থান। এখানে গোহত্যা বা গোমাংস-আনয়ন নিষিদ্ধ। বহু হিন্দু ও জৈনগণের প্রতিবৎসর এখানে সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল কর।

সঞ্চয়।

সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য।

যেমন জগতে যে ঘটনাটিকে কেবল এইমাত্র জানি যে, তাহা ঘটিয়াছে, কিন্তু কেন ঘটিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাপর কি, জগতের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহা না জানিলে তাহাকে পুরাপুরি আমাদের জ্ঞানে জানা হয় না—তেম্নি জগতে যে সত্য কেবল আছে মাত্র বলিয়াই জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো আনন্দই নাই, তাহা আমার হৃদয়ের পক্ষে একেবারে নাই বলিলেই হয়। এই যে এত-বড় জগতে আমরা রহিয়াছি, ইহার অনেকটাকেই আমাদের জানা-জগতের সামিল সম্পূর্ণ করিয়া আনিতে পারি নাই, এবং ইহার অধিকাংশই আমাদের মনোহর জগতের মধ্য ভুক্ত হইয়া আমাদের আপন হইয়া উঠে নাই।

অথচ, জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব, ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে পরিমাণে আমার অতীত, সেই পরিমাণে আমিই ছোট। সেই জন্য আমার মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমার কর্ম্মশক্তি নিখিলকে কেবলি অধিক করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এম্নি করিয়াই আমাদের সত্তা সত্যে ও শক্তিতে বিস্তৃত হইয়া উঠে।

এই বিকাশের ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ কোন্ কাজে লাগে? সে কি সত্যের যে বিশেষ অংশকে আমরা বিশেষ করিয়া সুন্দর বলি—কেবল তাহাকেই আমাদের হৃদয়ের কাছে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া বাকি অংশকে ম্লান ও তিরস্কৃত করিয়া দেয়? এ যদি হয়, তবে ত সৌন্দর্য্য আমাদের বিকাশের বাধা—নিখিল সত্যের মধ্যে হৃদয়কে ব্যাপ্ত হইতে দিবার পক্ষে সে আমাদের অন্তরায়। সে ত তবে সত্যের মাঝখানে বিন্ধ্যাচলের মত উঠিয়া তাহাকে সুন্দর-অসুন্দরের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে চলাচলের পথকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, তাহা নহে;—জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই

আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, সৌন্দর্য্যবোধও তেম্‌নি সমস্ত সত্যকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে, এই তাহার একমাত্র সার্থকতা। সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয় এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী।

গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর, সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড় করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদার প্রাচুর্য্য অথচ তেম্‌নি কঠিন সংযম;—তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দ্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে। এই যে একদিকে ফুটিয়া-পড়া এবং আর একদিকে আটিয়া-ধরা, ইহারই ছন্দে ছন্দে সৌন্দর্য্য,—বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়া এবং টান-রাখার নিত্য লীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছেন। যাদুকর অনেকগুলি গোলা লইয়া যখন খেলা করে, তখন গোলাগুলিকে একসঙ্গে ছুড়িয়া-ফেলা এবং লুফিয়া-ধরার দ্বারাই আশ্চর্য্য চাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার মধ্যে যদি কোনো-একটা গোলার কেবল ক্ষণকালীন অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে, তবে হয় তাহার উঠা নয় পড়া দেখি—তাহাতে দেখার পূর্ণতা হয় না বলিয়া আনন্দের পূর্ণতা ঘটে না। জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি, ততই জানিতে পারি, ভালমন্দ, সুখদুঃখ, জীবনমৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্বসঙ্গীতের ছন্দ রচনা করিতেছে—সমগ্রভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই, সৌন্দর্য্যের কোথাও লাঘবতা নাই। জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্য্যবোধের শেষ লক্ষ্য। মানুষ তেম্‌নি করিয়া দেখিবার দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, তাহার আনন্দকে ততই জগতের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতেছে—পূর্ব্বে যাহা নিরর্থক ছিল ক্রমেই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বে সে যাহার প্রতি উদাসীন ছিল ক্রমে সে তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছে, এবং যাহাকে বিরুদ্ধ বলিয়া জানিত, তাহাকে বৃহতের মধ্যে দেখিয়া তাহার ঠিক স্থানটিকে দেখিতে পাইতেছে ও তৃপ্তিলাভ করিতেছে। বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্য্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস মানুষের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যকে অনেক সময় আমরা নিখিল সত্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখি এবং

তাহাকে লইয়া দল বাঁধিয়া বেড়াই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা, সৌন্দর্য্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্য্যের বিশেষভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গীতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়। স্বয়ং ঈশ্বরকেও এইরূপ নিজের বিশেষ-দলভুক্ত করিয়া বড়াই করিয়া এবং অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়াইতে মানুষকে দেখা গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য্যকে চারিদিক্ হইতে বিশেষ করিয়া লইয়া জগতের আর সমস্ত ডিঙাইয়া কেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ানো সংসারের পনেরো-আনা লোকের কর্ম্ম নহে। কেবলি সুন্দর-অসুন্দর বাঁচাইয়া জৈন তপস্বীদের মত প্রতি পদক্ষেপের হিসাব লইয়া চলিতে গেলে চলাই হয় না।

পৃথিবীতে, কি সৌন্দর্য্যে, কি শুচিতায়, যাহাদের হিসাব নিরতিশয় সূক্ষ্ম, তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। তাহাদিগকে বলে গ্রাম্য। মোটা-হিসাবের লোকেরা সসঙ্কোচে তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

য়ুরোপের সাহিত্যে, সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রাকৃত, তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে hum-drum বলিয়া একেবারে ঝাটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। আমার বেশ মনে আছে—অনেকদিন হইল, কোনো বড় লেখকের লেখা একখানি ফরাসী-বহির ইংরেজী তর্জ্জমা পড়িয়াছিলাম। সে বইখানি নামজাদা। কবি স্যুইন্‌বরন্ তাহাকে Gospel of Beauty অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মশাস্ত্র উপাধি দিয়াছেন। তাহাতে একদিকে একজন পুরুষ আর একদিকে একজন স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনের মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে। সংসারের যাহা-কিছু প্রতিদিনের, যাহা-কিছু চারিদিকের, যাহা-কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে-পদে অপমান করিয়া সমস্ত বইখানির মধ্যে আশ্চর্য্য লিপিচাতুর্য্যের সহিত রঙের পর রং, সুরের পর সুর চড়াইয়া সৌন্দর্য্যের একটি অতি দুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতি তীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার ত মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি পড়ি নাই। আমার কেবলি মনে হইতেছিল, সৌন্দর্য্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনই করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনমতেই খাপ্ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে

থাকে, তবে সৌন্দর্য্যে ধিক্ থাক্। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।

সৌন্দর্য্য জাত মানিয়া চলে না—সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূল-সুর, সৌন্দর্য্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়—সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই। একদিন ফাল্গুনমাসের দিনশেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম—বিকশিত সর্ষের ক্ষেত হইতে গন্ধ আসিয়া সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পাড়, সেই ঝিকিমিকি বিকালবেলাটিকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না, তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে; যাহাকে ভুলিতাম, তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই। সৌন্দর্য্যে আমরা যেটিকে দেখি, কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি; মধুর গান সমস্ত জল-স্থল-আকাশকে, অস্তিত্বমাত্রকেই মর্য্যাদাদান করে। যাহারা সাহিত্যবীর, তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা, ছন্দ ও রচনারীতির সৌন্দর্য্য দিয়া এমন সকল জিনিষকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করেন, অতিপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না। অভ্যাসবশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া জানি—তাঁহারা সেই সামান্যের প্রতি তাঁহাদের রচনাসৌন্দর্য্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য নহে, সৌন্দর্য্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্দর্য্য ও তাহার মূল্য ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যের আলোকে আমরা অতি পরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই বলিয়া, সুপরিচিত এবং অপরিচিতকে আমরা একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্ব্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি।

কিন্তু মানুষের যখন বিকৃতি ঘটে, তখন সৌন্দর্য্যকে সে তাহার পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে উল্টা কাজে লাগাইতে থাকে। মাথাকে শরীর হইতে কাটিয়া লইলে সেই কাটামুণ্ড শরীরের যেমন বিরুদ্ধ হয়, এ তেম্নি। সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া লইলে সাধারণের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্যকে দাঁড় করান হয়; তাহাকে সত্যের বরশত্রু করিয়া তাহার সাহায্যে সামান্যের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায় করা হয়। বস্তুত সে জিনিষটা তখন সৌন্দর্য্যের যথার্থ ধর্ম্মই পরিহার করে। ধর্ম্মই বল, সৌন্দর্য্য বল, যে-কোনো বড় জিনিষই বল না, যখনি তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া

তাহাকে লইয়া দল বাঁধিয়া বেড়াই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা, সৌন্দর্য্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্য্যের বিশেষত্বগুলির অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গীতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়। স্বয়ং ঈশ্বরকেও এইরূপ নিজের বিশেষ-দলভুক্ত করিয়া বড়াই করিয়া এবং অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়াইতে মানুষকে দেখা গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য্যকে চারিদিক্ হইতে বিশেষ করিয়া লইয়া জগতের আর সমস্ত ডিঙাইয়া কেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ানো সংসারের পনেরো-আনা লোকের কর্ম্ম নহে। কেবলি সুন্দর-অসুন্দর বাঁচাইয়া জৈন তপস্বীদের মত প্রতি পদক্ষেপের হিসাব লইয়া চলিতে গেলে চলাই হয় না।

পৃথিবীতে, কি সৌন্দর্য্যে, কি শুচিতায়, যাহাদের হিসাব নিরতিশয় সূক্ষ্ম, তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। তাহাদিগকে বলে গ্রাম্য। মোটা-হিসাবের লোকেরা সসঙ্কোচে তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

য়ুরোপের সাহিত্যে, সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রাকৃত, তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে hum-drum বলিয়া একেবারে ঝাটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। আমার বেশ মনে আছে—অনেকদিন হইল, কোনো বড় লেখকের লেখা একখানি ফরাসী-বহির ইংরেজী তর্জ্জমা পড়িয়াছিলাম। সে বইখানি নামজাদা। কবি সুইন্‌বরন্ তাহাকে Gospel of Beauty অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মশাস্ত্র উপাধি দিয়াছেন। তাহাতে একদিকে একজন পুরুষ আর একদিকে একজন স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনের মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে। সংসারের যাহা-কিছু প্রতিদিনের, যাহা-কিছু চারিদিকের, যাহা-কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে-পদে অপমান করিয়া সমস্ত বইখানির মধ্যে আশ্চর্য্য লিপিচাতুর্য্যের সহিত রঙের পর রং, সুরের পর সুর চড়াইয়া সৌন্দর্য্যের একটি অতি দুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতি তীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার ত মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি পড়ি নাই। আমার কেবলি মনে হইতেছিল, সৌন্দর্য্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনই করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনমতেই খাপ্ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে

থাকে, তবে সৌন্দর্য্যে ধিক্ থাক্। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।

সৌন্দর্য্য জাত মানিয়া চলে না—সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূল-স্বর, সৌন্দর্য্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়—সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই। একদিন ফাল্গুনমাসের দিনশেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম—বিকশিত সর্ষের ক্ষেত হইতে গন্ধ আনিয়া সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পাড়, সেই ঝিকিমিকি বিকালবেলাটিকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না, তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে; যাহাকে ভুলিতাম, তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই। সৌন্দর্য্যে আমরা যেটিকে দেখি, কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি; মধুর গান সমস্ত জল-স্থল-আকাশকে, অস্তিত্বমাত্রকেই মর্য্যাদাদান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর, তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা, ছন্দ ও রচনারীতির সৌন্দর্য্য দিয়া এমন সকল জিনিষকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করেন, অতিপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না। অভ্যাসবশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া জানি—তাঁহারা সেই সামান্যের প্রতি তাঁহাদের রচনাসৌন্দর্য্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য নহে, সৌন্দর্য্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্দর্য্য ও তাহার মূল্য ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যের আলোকে আমরা অতি পরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই বলিয়া, সুপরিচিত এবং অপরিচিতকে আমরা একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্ব্বতার মধ্যে গম্ভীর করিয়া উপলব্ধি করি।

কিন্তু মানুষের যখন বিকৃতি ঘটে, তখন সৌন্দর্য্যকে সে তাহার পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে উল্টা কাজে লাগাইতে থাকে। মাথাকে শরীর হইতে কাটিয়া লইলে সেই কাটামুণ্ড শরীরের যেমন বিরুদ্ধ হয়, এ তেম্নি। সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া লইলে সাধারণের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্যকে দাঁড় করান হয়; তাহাকে সত্যের শত্রু করিয়া তাহার সাহায্যে সামান্যের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায় করা হয়। বস্তুত সে জিনিষটা তখন সৌন্দর্য্যের যথার্থ ধর্ম্মই পরিহার করে। ধর্ম্মই বল, সৌন্দর্য্য বল, যে-কোনো বড় জিনিষই বল না, যখনি তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া

একটু বিশেষ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়, তখনই তাহার স্বরূপটি নষ্ট হইয়া যায়। নদীকে আমার করিয়া লইবার জন্ত বাঁধিয়া লইলে সে আর নদীই থাকে না, সে পুকুর হইয়া পড়ে।

এইরূপে সংসারে অনেকে সৌন্দর্য্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহাকে ভোগবিলাসের অহঙ্কারের ও মত্ততার সামগ্রী করিয়া তোলাতেই কোনো কোনো সম্প্রদায় সৌন্দর্য্যকে বিপদ্ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। তাহারা বলে, সৌন্দর্য্য কেবল কনকলঙ্কাপুরী মজাইবার জন্তই আছে।

ঈশ্বরের প্রসাদে বিপদ্ কিসে নাই! জলে বিপদ্, স্থলে বিপদ্, আগুনে বিপদ্, বাতাসে বিপদ্। বিপদ্‌ই আমাদের কাছে প্রত্যেক জিনিষের সত্য পরিচয় ঘটায়, তাহার ঠিক ব্যবহারটি শিখাইতে থাকে।

ইহার উত্তরে কথা উঠিবে—জলে-স্থলে, আগুনে-বাতাসে আমাদের এত প্রয়োজন যে, তাহাদের নহিলে একমুহূর্ত্ত টিকিতে পারি না—সুতরাং সমস্ত বিপদ্ স্বীকার করিয়াই তাহাদিগকে সকলরকম করিয়া চিনিয়া লইতে হয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যরসভোগ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, সুতরাং তাহা নিছক্ বিপদ্। অতএব তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝি—ঈশ্বর আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্তই সৌন্দর্য্যের মায়ামৃগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় করাইতেছেন। ইহার প্রলোভনে আমরা অসাবধান হইলেই জীবনের সাধারণটি চুরি যায়।

রক্ষা কর! ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সংসার পরীক্ষাস্থল, এই সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকার কথা আর সহ্য হয় না। আমাদের নকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের খাঁটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করিও না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নাই এবং পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনই নাই। সে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষাই আছে। সেখানে কেবল বিকাশেরই ব্যাপার চলিতেছে। সেই জন্য, মানুষের মনে সৌন্দর্য্যবোধ যে এমন প্রবল হইয়া আছে, সে আমাদের বিকাশ ঘটাইবে বলিয়াই। বিপদ্ থাকে ত থাক্, তাই বলিয়া বিকাশের পথকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে মঙ্গল নাই।

বিকাশ বলিতে কি বুঝায়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতরকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে, ততই প্রত্যেকের বিকাশ। স্বর্গরাজ ইন্দ্র যদি আমাদের সেই যোগসাধনের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্তই সৌন্দর্য্যকে মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া দেন, ইহা সত্য হয়, তবে ইন্দ্রদেবের সেই প্রবঞ্চনাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া দুই চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই। তাঁহার কোনো দূতকেই মারিয়া খেদাইতে হইবে, এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। এ কথা নিশ্চয় জানি, সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় এবং অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে কেবল বিনা-প্রয়োজনে মিলন—সে কেবলমাত্র আনন্দের মিলন। নীলাকাশ যখন নিতান্তই শুধু শুধু আমাদের হৃদয় দখল করিয়া সমস্ত শ্যামল পৃথিবীর উপর তাহার জ্যোতির্ম্ময় পীতাম্বরটি ছড়াইয়া দেয়, তখনি আমরা বলি, সুন্দর। বসন্তে গাছের নূতন কচিপাতা বনশ্রীদের আঙুলগুলির মত যখন একেবারেই বিনা আবশ্যকে আমাদের দুই চোখকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতে থাকে, তখনি আমাদের মনে সৌন্দর্য্যরস উছলিয়া উঠে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ কেবল সুন্দরনামক সত্যের একটা অংশের দিকেই আমাদের হৃদয়কে টানে ও বাকি অংশ হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দেয়, তাহার এই অন্যায় বদ্‌নাম কেমন করিয়া ঘুচান যাইবে, সেই কথাই ভাবিতেছি।

আমাদের জ্ঞানশক্তি কি জগতের সমস্ত সত্যকেই এখনি আমাদের জানার মধ্যে আনিয়াছে? আমাদের কর্ম্মশক্তি কি জগতের সমস্ত শক্তিকে আজই আমাদের ব্যবহারের আয়ত্ত করিয়াছে? জগতের এক অংশ আমাদের জানা, অধিকাংশই অজানা। বিশ্বশক্তির সামান্য অংশ আমাদের কাজে খাটিতেছে, অধিকাংশকেই আমরা ব্যবহারে লাগাইতে পারি নাই। তা হউক, তবু আমাদের জ্ঞান সেই জানা-জগৎ না-জানা-জগতের দ্বন্দ্ব প্রতিদিন একটু একটু ঘুচাইয়া চলিয়াছে—যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া জগতের সমস্ত সত্যকে ক্রমে আমাদের বুদ্ধির অধিকারে আনিতেছে ও জগৎকে আমাদের মনের জগৎ, আমাদের জ্ঞানের জগৎ করিয়া তুলিতেছে; আমাদের কর্ম্মশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন করিয়া তুলিতেছে এবং বিদ্যুৎ-জল-অগ্নি-বাতাস দিনে দিনে আমাদেরই বৃহৎ কর্ম্মশরীর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধও ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎকে আমাদের আনন্দে জগৎ করিয়া তুলিতেছে—সেইদিকেই তাহার গতি। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ

জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

কিন্তু পাওয়া না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়া ছাড়া পাওয়া যাইতেই পারে না; দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ছাড়া বিকাশ হইতেই পারে না, সৃষ্টির গোড়াকার এই নিয়ম। একের দুই হওয়া এবং দুয়ের এক হইতে থাকাই বিকাশ।

বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখ। মানুষের একদিন এমন অবস্থা ছিল, যখন সে গাছে, পাথরে, মানুষে, মেঘে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, নদীতে, পর্ব্বতে প্রাণি অপ্রাণীর ভেদ দেখিতে পাইত না। তখন সবই তাহার কাছে যেন সমানধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে অভেদ হইতে প্রথমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তাহা যদি না হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণগুলিকে সে কোনো দিন জানিতে পারিত না। এদিকে লক্ষণগুলিকে যতই সে সত্য করিয়া জানিতে লাগিল, দ্বন্দ্ব ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিল। প্রথমে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝখানের গণ্ডিটা ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল; কোথায় উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ, তাহা আর ঠাহর করা যায় না। তাহার পরে আজ, ধাতুদ্রব্য—যাহাকে জড় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি—তাহার মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব যে ভেদবুদ্ধির সাহায্যে আমরা প্রাণ জিনিষটাকে চিনিয়াছি, চেনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভেদটা ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকিবে, অভেদ হইতে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হইতেই ঐক্য বাহির হইবে এবং অবশেষে বিজ্ঞান একদিন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে সমান সুরে বলিবে—সর্ব্বং প্রাণ এজতি"—সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে।

যেমন সমস্তই প্রাণে কাঁপিতেছে, তেম্‌নি সমস্তই আনন্দ, উপনিষদ্ এ কথাও বলিয়াছেন। জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবার পথে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা প্রথমে একান্ত হইয়া মাথা তোলে। নহিলে সুন্দরের পরিচয় ঘটা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্য্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এইজন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র। খুব একটা টক্‌টকে রং, খুব একটা গঠনের বৈচিত্র্য, নিজের চারিদিকের মানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে। সঙ্গীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া

আকাশ মাৎ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ পায় ততই স্বাতন্ত্র্য নহে সুসঙ্গতি, আঘাত নহে আকর্ষণ, আধিপত্য নহে সামঞ্জস্য—আমাদিগকে আনন্দদান করে। এইরূপে সৌন্দর্য্যকে প্রথমে চারিদিক্ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্য্যকে চিনিবার চর্চ্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্য্যকে চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া-লইয়া চারিদিকেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি।

একটুখানির মধ্যে দেখিলে আমরা অনিয়ম দেখি, চারিদিকের সঙ্গে অখণ্ড করিয়া মিলাইয়া দেখিলেই নিয়ম আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তখন,—যদি-চ ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া যায় ও ঢেলা মাটিতে পড়ে, সোলা জলে ভাসে ও লোহা জলে ডোবে, তবু এই সমস্ত দ্বৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।

জ্ঞানকে ভ্রমমুক্ত করিবার এই যেমন উপায়, তেম্‌নি আনন্দকেও বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে খণ্ডতা হইতে ছুটি দিয়া সমগ্রের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যেমন উপস্থিত যাহাই প্রতীতি হয়, তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বিজ্ঞানে বাধে, তেম্‌নি উপস্থিত যাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহাকেই সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লইলে আনন্দের বিঘ্ন ঘটে। আমাদের প্রতীতিকে নানাদিক্ দিয়া সর্ব্বত্র যাচাই করিয়া লইলে তবেই তাহার সত্যতা স্থির হয়—তেম্‌নি আমাদের অনুভূতিকেও তখনি আনন্দ বলিতে পারি, যখন সংসারের সকল দিকেই সে মিশ খায়। মাতাল মদ খাইয়া যতই সুখবোধ করুক্, নানা দিকেই সে সুখের বিরোধ ;—তাহার আপনার সুখ, অন্যের দুঃখ, তাহার আজিকার সুখ, কালিকার দুঃখ, তাহার প্রকৃতির এক অংশের সুখ, প্রকৃতির অন্য অংশের দুঃখ। অতএব এ সুখে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, আনন্দভঙ্গ হয়। প্রকৃতির, সমস্ত সামঞ্জস্যের সঙ্গে ইহার মিল হয় না।

মানা দুঃখ, নানা সুখদুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ সুন্দরকে, আনন্দকে সত্যের সব দিকে ছড়াইয়া বৃহৎ করিয়া চিনিয়া লইতেছে। তাহার এই চেনা কোথায় সঞ্চিত হইতেছে? জগদ্‌ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকদিন হইতে অনেক লোকের দ্বারা স্তুপীকৃত হইয়া বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে—এই সুযোগে একজনের দেখা আর একজনের দেখার সঙ্গে, এককালের দেখা আর এককালের দেখার সঙ্গে পরখ করিয়া লইবার সুবিধা হয়। এমন নহিলে বিজ্ঞান পাকা হইতেই পারে না। তেম্‌নি মানুষকর্তৃক সুন্দরের পরিচয়, আনন্দের পরিচয়, দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যে সঞ্চিত হইতেছে। সত্যের উপরে মানুষের হৃদয়ের অধিকার কোন্ পথ দিয়া কেমন

করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে—সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মানুষের সমস্ত মন, ধর্ম্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে ও এমন করিয়া ক্ষুদ্রকেও মহৎ এবং দুঃখকেও প্রিয় করিয়া তুলিতেছে—মানুষ নিয়তই আপনার সাহিত্যে সেই পথের চিহ্ন রাখিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের পাঠক, তাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই রাজপথটির অনুসরণ করিয়া—সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কি চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কি পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মানুষের কাছে মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ ধরিতেছে—তাহাই সন্ধান করিয়া ও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, মানুষ কি জানে, তাহাতে নয়, কিন্তু মানুষ কিসে আনন্দ পায়, তাহাতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সেই পরিচয়ই আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। যখন দেখি, সত্যের জন্য কেহ নির্ব্বাসন স্বীকার করিতেছে, তখন সেই বীরপুরুষের আনন্দের পরিধি আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, সে আনন্দ এত বড় জায়গা অধিকার করিয়া আছে যে নির্ব্বাসনদুঃখ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে। এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দের মহত্ব প্রমাণ হইতেছে। টাকার মধ্যেই যাহার আনন্দ, সে টাকার ক্ষতির ভয়ে অসত্যকে, অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে। সে চাকরী বজায় রাখিতে অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হয় না;—এই লোকটি যত পরীক্ষাই পাশ করুক, ইহার যত বিদ্যাই থাক্, আনন্দশক্তির সীমাতেই ইহার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল, যাহাতে রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহা যখন দেখি, তখন প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতা দেখিয়া যেন নিজেরই গুপ্তধন অঙ্কের মধ্যে আবিষ্কার করে—নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতে পায়। এই মহৎচরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।

অতএব মানুষ আপনার আনন্দপ্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ, শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।

আমি জানি, সাহিত্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমাণ আহরণ করিয়া আমার মোট-কথাটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা অত্যন্ত সহজ। সাহিত্যের মধ্যে যেখানে যাহা-কিছু স্থান পাইয়াছে, তাহার সমস্তটার জবাবদিহি করিবার দায় যদি আমার উপরে চাপানো হয় তবে সে আমার বড় কম বিপদ নয়। কিন্তু মানুষের সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে

শত শত আত্মবিরোধ থাকে। যখন বলি, জাপানীরা নির্ভীক সাহসে লড়াই করিয়াছিল—তখন জাপানী সেনাদলের প্রত্যেক লোকটির সাহসের হিসাব লইতে গেলে নানা স্থানেই ত্রুটি দেখা যাইবে—কিন্তু ইহা সত্য, সেই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের ভয়কেও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া জাপানীদের সাহস যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। সাহিত্যে মানুষ বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—সে ক্রমশই তাহার আনন্দকে খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া ব্যক্ত করিতেছে—বড় করিয়া দেখিলে এ কথা সত্য—বিকৃতি এবং ত্রুটি যতই থাক্, তবু সব লইয়াই এ কথা সত্য।

একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে,—সাহিত্য দুইরকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়। সত্যকে গোচর করানো বড় শক্ত কাজ। হিমালয়ের শিখর কত-হাজার ফিট্ উচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে, তাহা তন্নতন্ন করিয়া বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না। যিনি কয়েকটি কথায় এই হিমালয়কে আমাদের গোচর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা কবি বলি। হিমালয় কেন, একটা পানাপুকুরকেও আমাদের মনশ্চক্ষুর সাম্‌নে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে চোখে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকেই ভাষার ভিতর দিয়া দেখিলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখা হয়;—মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া যেটাকে দেখিতে পায়, ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটি'কই দেখাইতে পারে, তবে মন তাহাকে নূতন একটা রসলাভ করে। এইরূপে সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মত হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়। কেবল নূতন নয়; ভাষার একটা বিশেষত্ব আছে; সে মানুষের নিজের জিনিষ—সে অনেকটা আমাদের মনগড়া;—এইজন্য বাহিরের যে-কোনো জিনিষকে সে আমাদের কাছে আনিয়া দেয়, সেটাকে যেন বিশেষ করিয়া তোলে। ভাষা যে ছবি আঁকে, সে ছবি যে যথাযথ ছবি বলিয়া আমাদের কাছে আদর পায়, তাহা নহে—ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়, এইজন্য সে ছবি আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করে। বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চোলাইয়া লইলে সে আমাদের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্য দিয়া যে ছবি আমাদের কাছে আসে, সে সমস্ত খুঁটিনাটি লইয়া আসে না। সে কেবল ততটুকুই আসে, যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে। এই জন্য তাহাকে একটি অখণ্ডরসের সঙ্গে দেখিতে পাই—কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য সেই রস ভঙ্গ করে না। সেই সুসম্পূর্ণ রসের ভিতর দিয়া দেখাতেই সে ছবি আমাদের অন্তঃকরণের কাছে এত অধিক করিয়া গোচর হইয়া উঠে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক্ দেখানো হইয়াছে, তাহা নহে—এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লী করিতে মজবুৎ লোক আমারা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্ত্তিমান্ করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষার এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ-সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই কিন্তু প্রত্যক্ষ-সংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ঐটুকুমাত্র নয়—এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্রমাত্রই সেইরূপ। রামায়ণের রাম যে কেবল মহান্ বলিয়াই আমাদিগকে আনন্দ দিতেছেন, তাহা নহে, তিনি আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ। রামকে যেটুকু দেখিলে একটি সমগ্ররসে তিনি আমাদের কাছে জাগিয়া উঠেন, সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই আমাদের কাছে আনিয়াছে; —এইজন্য এত স্পষ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি এবং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়াই মানুষের একটি বিশেষ আনন্দ। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা-কোনো সমগ্রভাবে পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া। সাহিত্য তেমনি করিয়া একটা সামঞ্জস্যের সুষমার মধ্যে সমস্ত চিত্র দেখায় বলিয়া আমরা আনন্দ পাই। এই সুষমা সৌন্দর্য্য।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যাহা তাহার উপকরণবিভাগ। পূর্ত্তবিভাগে কেবল যে ইমারৎ তৈরি হয়, তাহা নহে, তাহার দ্বারা ইটের পাঁজাও পোড়ান হয়। ইটগুলি ইমারৎ নয় বলিয়া সাধারণ লোক অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু পূর্ত্তবিভাগ তাহার মূল্য জানে। সাহিত্যের যাহা উপকরণ, সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য বড় কম নয়। এইজন্যই অনেক সময় কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য, কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে। ✓

হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হৃদয়ের ধর্ম্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়। অথচ কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলিয়া তাহার ব্যাকুলতাও অত্যন্ত বেশি। সেইজন্য যখন আমরা দেখি, একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্ম্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আমাদের শক্তি বাড়িয়া যায়। যে কথাটা প্রকাশ হইতেছে, তাহা বিশেষ মূল্যবান্ একটা-কিছু না হইলেও সেই প্রকাশব্যাপারের মধ্যেই যদি কোনো অসামান্যতা দেখা যায়, তবে মানুষ তাহাকে সমাদর করিয়া রাখে। সেইজন্য যাহা-তাহা অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র প্রকাশ করিবার লীলাবশতই প্রকাশ, সাহিত্যে অনাদৃত হয় নাই। তাহাতে মানুষ যে কেবল আপনার ক্ষমতাকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দদান করে, তাহা নহে—কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষ্য ধরিয়া শুদ্ধমাত্র আপনার প্রকাশধর্ম্মটাকে খেলানতেই তাহার যে আনন্দ—সেই নিতান্ত বাহুল্য আনন্দকে সে আমাদের মধ্যেও সঞ্চার করিয়া দেয়। যখন দেখি, কোনো মানুষ একটা কঠিন কাজ অবলীলাক্রমে করিতেছে, তখন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয় —কিন্তু যখন দেখি, কোনো কাজ নয়, কিন্তু যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষ্য লইয়া কোনো মানুষ আপনার সমস্ত শরীরকে নিপুণভাবে চালনা করিতেছে —তখন সেই তুচ্ছ উপলক্ষ্যের গতিভঙ্গীতেই সেই লোকটার যে প্রাণের বেগ, যে উদ্যমের উৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের ভিতরকার প্রাণকে চঞ্চল করিয়া সুখ দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাশধর্ম্মের লক্ষ্যহীন নৃত্য-চাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। স্বাস্থ্য শ্রান্তিহীন কর্ম্মনৈপুণ্যেও আপনাকে প্রকাশ করে, আবার, স্বাস্থ্য যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য, ইহাই সে বিনা কারণেও প্রকাশ করিয়া থাকে। সাহিত্যে তেমনি

মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্য্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশ শক্তির উৎসাহমাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। কারণ প্রকাশই আনন্দ—এইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিরত আপনার আনন্দরূপকে, অমৃতরূপকেই ব্যক্ত করিতেছে, তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিবেদন।

গ্রাহক মহাশয়দের নিকট বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের ভাণ্ডার প্রেরিত হইল। শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিনের ভাণ্ডার প্রায় প্রস্তুত। আপাততঃ উক্ত তিন সংখ্যা আমরা ভাণ্ডারের ষাণ্মাষিক মূল্য ধরিয়া গ্রাহক মহাশয়দের নিকট ভিঃ পিঃ করিতে চাই। যদি কেহ মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে চান তবে ঐ টাকা ডিসেম্বর মাস মধ্যে পৌঁছান আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কাহার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা ঐ সময় মধ্যে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

ভবিষ্যতে যাহাতে যথানিয়মে ভাণ্ডার প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যাহাতে ভাণ্ডার পাঠক মহাশয়দের অধিকতর সন্তোষ প্রদান করিতে পারে তাহার চেষ্টার ত্রুটী হইতেছে না। ভাণ্ডারে যে শ্রেণীর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা ছাড়া উৎকৃষ্ট উপন্যাস, গল্প, নক্সা, জীবনচরিত, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতিও প্রকাশিত হইবে।

কার্ত্তিক হইতে ভাণ্ডারের নবপর্য্যায় হইতেছে সেজন্য কার্ত্তিক হইতে ভাণ্ডারের ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইল। নবপর্য্যায় ভাণ্ডারে চিত্রাদি নিয়মিত থাকিবে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে ভাণ্ডার প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইতে পাঠকগণ ভবিষ্যতে ভাণ্ডার কিরূপ হইবে তাহার কিছু আভাষ পাইবেন। সম্পূর্ণ পরিচয় নবপর্য্যায়ে গ্রহণ করিবেন। নবপর্য্যায়ে ভাণ্ডারের বিস্তারিত বিবরণ আশ্বিনের ভাণ্ডারে বিস্তৃত দেওয়া হইবে।

তিন সপ্তাহ মধ্যে নবপর্য্যায়ের কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের ভাণ্ডার বাহির হইবে। ভাণ্ডারের কার্য্যালয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। টাকাকড়ি ও প্রবন্ধ পত্রাদি এক্ষণে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার ভাণ্ডার
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কয়েক খানি নূতন পুস্তক।

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য গ্রন্থাবলী ছয় খণ্ড বা[hi]
হইয়াছে—(১ম) বিচিত্র প্রবন্ধ ১৷০, ঐ বাঁধাই ১৸০ (২য়) প্রা[চীন]
সাহিত্য ৷৷০ (৩য়) লোক সাহিত্য ৷৵০ (৪র্থ) সাহিত্য ৷৷৵০ (৫ম) আধু[নিক]
সাহিত্য ৷৷৵০ (৬ষ্ঠ) হাস্যকৌতুক ৷৵০। সপ্তম ভাগ যন্ত্রস্থ; অন্যান্য খণ্ড ক্র[মশঃ]
বাহির হইতেছে।

২। বর্ত্তমান রণনীতি—মূল্য ৸০ বার আনা।

৩। জালিয়াৎ ক্লাইভ—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য
বার আনা।

৪। বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন প্রণীত, মূল্য
দুই টাকা।

ইহা নূতন রকমের গানের বই, দুই ভাগে বিভক্ত একত্রে ব[াঁধা]
সূচীপত্র নূতন ধরণের। রাগরাগিণীর তালিকা পৃথক ভাবে দে[ওয়া]
হইয়াছে।

৫। সংসার চিত্র—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৷৵০

৬। শত গান—শ্রীমতী সরলা দেবী প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, মূল্য ২

৭। অপর্ণা—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ৷৷৵০ আনা।

৮। ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রণীত—বিদ্যাপতি ১৷৷০, [...]
সঙ্গীত ৷০, লাঞ্ছিতের সম্মান ৷৵০ আনা।

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা—দিনময়ী প্রেসে,
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

ভাণ্ডার

তৃতীয় বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ?

(১)

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ?—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কেহ কেহ মনে করেন দেশ বিলক্ষণ সুখ শান্তিতে ছিল, কতকগুলি উচ্চাভিলাষী লোক আকাশ কুসুমের অন্বেষণে হৈ চৈ করিয়া অশান্তিতে দেশ প্লাবিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বলেন আজ দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যে শুষ্ক বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করা হইয়াছে সেই জাতীয় বৃক্ষে পুনরায় পত্রোদ্‌গম দেখিয়া কতক স্বার্থবিশিষ্ট সম্প্রদায় ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য নানা প্রকার কূট ও ভেদ নীতি অবলম্বনে এই অশান্তির স্রোতে দেশ ভাসাইয়াছেন। কেহ বলেন দেশে প্রচুর বিদেশীয় অর্থাগমে দিন দিন দেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কেহ বলেন শোষক পক্ষীর

পাখার বাতাসে দেশ নিদ্রা যাইতেছিল, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম চক্ষুর শীতল শোষণে দেশ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল বাদানুবাদের মধ্যে সকল পক্ষই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে দেশ অশান্তিময় হইয়াছে। সুশাসন গুণেই হউক, কিম্বা কুশাসন দোষেই হউক, অর্থের প্রাচুর্য্য বশতঃই হউক অথবা ঘোর দারিদ্র্য জন্যই হউক, শান্তি দেশ হইতে অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। কি রাজনীতি, কি শাসন প্রণালী, কি শিক্ষা, কি বাণিজ্য ব্যবসায়, কিছুরই স্থিরতা নাই, কোথাও সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস বা ভক্তি নাই, সর্ব্বত্রই সন্দেহ, অবিশ্বাস, অশান্তি বিরাজমান। এই শোচনীয় অবস্থাতে কেহ কেহ ভীত, কেহ কেহ উদ্দীপ্ত, আর অধিকাংশই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন, কিন্তু এই অশান্তিতে ভীত বা বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কিছুই নাই। ইহাতে কোনরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব কিংবা কোন জাতিধ্বংসের বিভীষিকা সন্দর্শন একান্ত হাস্যাস্পদ। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে অশান্তি নহে, প্রত্যুত জাতীয় জীবনের নবোচ্ছ্বাসের অস্থিরতা এবং সেই অস্থিরতা জনিত অননুভূতপূর্ব্ব আতঙ্কমাত্র। যে শান্তির জন্য লোক বা সম্প্রদায় বিশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন তাহা প্রকৃত শান্তি নহে, জড়তা বা নিশ্চেষ্টতার রূপান্তর মাত্র। চাও সে শান্তি?—তবে যাও নিদ্রা আবার। শিক্ষা উন্নতি আকাঙ্ক্ষা সকল গঙ্গস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আবার সেই যুগান্তের বায়ুশূন্য আলোশূন্য জীবশূন্য, অন্ধকার রাশি মধ্যে প্রবেশ কর, আবার জড়পদার্থের ন্যায় শরীর ঢালিয়া দিয়া নির্ব্বাণমুক্তির ধ্যানে মগ্ন হও,—সে শান্তি দুর্লভ হইবে না। কিন্তু যদি জাগ্রত থাকিতে চাও, চক্ষু মেলিয়া জগতের অনন্ত শক্তির অনন্ত লীলা দেখিতে চাও; যদি মানব জাতির উত্থান পতন, উন্নতি অবনতির মধ্যে মানবজীবনের

কোন উপদেশ উপলব্ধি করিতে চাও; যদি এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া যে জীবন সংগ্রাম চলিতেছে তাহাতে যোগ দান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাও; যদি সেই সংগ্রামে জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া থাক; জীবন কাহাকে বলে, মৃত্যুই বা কিসে হয় তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে—তবে অশান্তিই বল আর কর্ম্মফলই বল, এই অপরিহার্য্য দুর্নিবার উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিতেই হইবে। আমরা এতকাল প্রবল রাজশক্তির ছায়ায় এক প্রকার পারিবারিক শাসনাধীনে লালিত পালিত হইয়াছি, ক্ষীণ প্রজাশক্তির অস্তিত্ব বিনষ্ট না হইলেও তাহার চৈতন্য ছিল না; আমাদের ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় আত্মনির্ভর কিছুমাত্র ছিল না, সকলই ললাট লিপিতে পরিণত হইয়াছিল। আজ এই সুপ্তোত্থিত প্রজাশক্তির সহিত সেই প্রবল রাজশক্তির প্রথম সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। সময় ও অবস্থাভেদে এই সংঘর্ষ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ঘটিয়াছে; কিন্তু কুত্রাপি ইহা হইতে রাজ্যের তেজোবৃদ্ধি ব্যতীত সংহারানল সমুত্থিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহারা এই সংঘর্ষের প্রথম নায়ক এবং প্রধান ফলভোগী তাঁহারাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিভীষিকা কল্পনা করিয়া সমধিক আত্মহারা হইয়াছেন।

এই যদি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা হয়, আর এই অশান্তি যদি সেই সংঘর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? পশ্চাৎপদ হওয়া যদি অসম্ভব, অগ্রসর হওয়াও ত সহজ নহে। এক দিকে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির স্বার্থ মিশ্রিত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত শাসন পদ্ধতি (well organized system of administration,) যাহার প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় শক্তি সঞ্চার হইতেছে এবং ঊর্দ্ধ

নাতের জালের ন্যায় যাহার দূরবর্ত্তী প্রান্তদেশ স্পর্শ মাত্র কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত সমভাবে কাঁপিয়া উঠিতেছে। অপর দিকে এক সদ্য সুপ্তোত্থিত নিস্তেজ বিশ্লিষ্ট জাতির হস্তপদাদির আক্ষেপ প্রক্ষেপ মাত্র। প্রায় কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই, কেহ ডাইনে যাইতেছেন, কেহ বামে যাইতেছেন, কেহবা পশ্চাৎ দিক হইতে উভয়কে টানিতেছেন, প্রায় প্রত্যেকেই নেতা, সকলেই পথ প্রদর্শক; অনেকেই উচ্চভাব প্রচার জন্য অবতীর্ণ, কিন্তু কার্য্য করিতে অল্পই অগ্রসর। সদনুষ্ঠান হইতেছেনা এরূপ নহে; কিন্তু কোন অনুষ্ঠানেরই পদ্ধতি নাই। বিচ্ছিন্ন, অসংযত, লক্ষ্যশূন্য, ভীতিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে দেশ ছাইয়া পড়িতেছে, অথচ তাহার নিয়ম কি নিরস্তা কিছুই নাই। যে যেখানে পারিতেছেন দু এক ঘা মারিতেছেন, আর যেন মনে করিতেছেন তাঁহার নাম ভবিষ্য ইতিহাসে খোদাই হইল, বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাবলী ভবিষ্য ইতিহাসে উঠিতে কিংবা তাহার অধিকাংশই কাহিনীতে পরিণত হইবে তাহাই গুরুতর সন্দেহের বিষয়, ব্যক্তিগত নাম খোদাইত অনেক দূরের কথা। যাহাই হউক নাম খোদার পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া সেই ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করুন, বর্ত্তমান ঘটনাবলীর ন্যায় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলিও শৃঙ্খলাবদ্ধ হউক, যেখানে যে টুকু শক্তি আছে তাহা কেন্দ্রস্থ করুন, দেশের সকল চেষ্টা সকল উদ্যম এক শক্তি বলে পরিচালিত হইয়া নানা দিকে প্রসারিত হউক। তারপর দেশের অদৃষ্টের সহিত ইতিহাস আপন সূত্র অপনিই গাঁথিবে। যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে জাতি দণ্ডায়মান হইয়াছে, সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতিরেকে তাহার ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করা অসম্ভব। an organized system can only be met by an organized system। লোহার আঘাতে লোহারই প্রয়োজন, অতএব উপস্থিত

ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে শক্তি সঞ্চয় এবং সঞ্চিত শক্তির সমবায় করা একান্ত আবশ্যক। এই শক্তি সমবায় করিতে হইলে একটী কেন্দ্র সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক, দেশে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল ক্ষমতাশালী চিন্তাশীল কর্ম্মবীর আছেন প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে লইয়া এই সমিতি গঠন করা উচিত, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যে সকল সমিতি, সম্প্রদায় আছে তৎ সমস্তই এই কেন্দ্র সমিতির শাসন ও নিয়মাধীন হওয়া আবশ্যক। এই কেন্দ্র সমিতি নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান অনুষ্ঠান সকল এক এক বিভাগের অন্তর্ভূত হইবে। জাতীয় ভাণ্ডার নামেই হউক আর যে নামেই হউক এই কেন্দ্রসমিতির এক তহবিল থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক বিভাগের যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূলধন আছে তাহার অতিরিক্ত রূপে এই তহবিল হইতে প্রত্যেক বিভাগে বৎসর বৎসর আবশ্যকীয় অর্থ বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। এই নিয়মে জাতীয় ভাণ্ডারের অর্থাগমের যেরূপ সুবিধা হইবে, সেইরূপ প্রত্যেক বিভাগের উন্নতি ও কলেবর পুষ্টিও হইতে পারিবে। জেলায় জেলায় যে সকল সমিতি, সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এমন কি কলিকাতায় যে সকল ছোট বড় সদনুষ্ঠান হইতেছে তাহার কেন্দ্রস্থল অদ্যাপি গঠিত হয় নাই। যুক্তবঙ্গের মিলনমন্দির এখনও আকাশস্থ নিরবলম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় ভাবে নিরাকার উপাসনার উপদেশ দিতেছে। আমি ইষ্টকনির্ম্মিত গগণস্পর্শী চূড়ামণ্ডিত শুভ্র সৌধমালার কথা বলিতেছি না। সেই মিলনমন্দিরে জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিভাগক্রমে সকল বিষয়ের চিন্তা ও কর্ত্তব্যাবধারণের মন্ত্রণা হইয়াছিল। ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন তারিখে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে অতঃপর দেশে শক্তি সমবায়ের অধিবাস হইল জড় জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু দেশের

ললাটপট্টিকার সেই অধিবাসের পরই বিজয়া লিখিত আছে কি না তাহা ভগবান জানেন। অবশ্য আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, সে দিন দেশে যে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে তাহার কার্য্যও কতক কতক দৃষ্ট হইতেছে। নূতন ক্ষেত্রে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, জাতীয় অভাবের প্রতি নূতন আলোকে নূতন দৃষ্টি নিক্ষেপ হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা, লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্যে দেশের উদ্যম ও চেষ্টা শতধারে প্রসারিত হইয়াছে, ধনবানের সদনুষ্ঠানে স্পৃহা জন্মিয়াছে, দরিদ্রের শরীর বলে সেই অনুষ্ঠানের সহায়তার আকাজ্ক্ষা হইয়াছে। কিন্তু সকলই বিচ্ছিন্ন, সকলই বিশ্লিষ্ট—স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন সামঞ্জস্যের আকর্ষণ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইতেছে না, একতার ভাব প্রবল বেগে বহিতেছে সত্য, কিন্তু একতার ক্রিয়া এখনও আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণার সমষ্টিতে প্রবল বিশালবক্ষ নদীর উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু কত শত বিচ্ছিন্ন নির্ঝরিণী কিছুকাল এদিক ওদিক করিয়া বালুকা মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব সময় থাকিতে এই সকল সঞ্চিত শক্তির সমবায়ে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যাবশ্যক বোধ করি। নতুবা এই সকল বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান, এই সকল স্বতঃউৎপন্ন সমিতি সম্প্রদায় অচিরে বিলয়প্রাপ্ত না হইলেও উশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে এবং এক এক করিয়া প্রবল শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে নিস্তেজ নিষ্প্রভ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যখন কার্য্য হইতেছে তখন স্বাতন্ত্র্যে কি দোষ আছে? কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানকে এক সূত্রে গাঁথিলেই বা শক্তি বৃদ্ধি

কি প্রকারে হইতে পারে ? বরং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সমবায় করিতে গেলে কোন কোন অনুষ্ঠানের ক্ষতি হইবারও আশঙ্কা আছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে "ক্ষুদ্রনামপি বস্তুনাং সংহতি কার্য্য সাধিকা" এই ধ্রুব সত্যের প্রতি লক্ষ্য না করিলেও এই সকল বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানের স্থায়ীত্ব এবং কার্য্যকারীতা সংস্থাপন জন্যই এক সূত্রে তাহাদিগকে গাঁথিবার প্রয়োজন হইয়াছে. একবার ভাবিয়া দেখুন কিরূপ সামান্য ভিত্তির উপর এক একটী অনুষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এক জন সহৃদয় ব্যক্তির কথঞ্চিত বদান্যতার উপর জাতীয় শিক্ষা; কয়েক জন স্বতঃপ্রবৃত্ত পরিব্রাজকের মুষ্টি ভিক্ষার উপর বিজ্ঞান শিক্ষা; একজন উন্নতমনা বৃদ্ধের উপর শিল্প শিক্ষা; একজন ভীম পরাক্রম কর্ম্মবীরের উপর রাজনৈতিক আন্দোলন, আর কতকগুলি অক্লান্ত উদ্যমশীল, নায়ক বিহীন, অজাতশত্রু যুবকের উপর স্বদেশী আন্দোলন ন্যস্ত হইয়াছে। এরূপ অনুষ্ঠান কতকাল স্থায়ী হইতে পারে, এবং এরূপ অনুষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্রই বা কতদূর প্রসারিত হইতে পারে ? বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় অসাধারণ শক্তিবলে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ত অমর নহেন. আজ যদি তাঁহার শক্তি অপহৃত হয়, কল্য যদুবংশের ভীষণ অভিনয় আরম্ভ হইতে পারে। এইরূপ যে যে কর্ম্মবীর যে যে কর্ম্মক্ষেত্রে নায়করূপে অভিনয় করিতেছেন তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে যে যবনিকা পতন হইবে তাহা পুনরুত্তোলন করিবার শক্তি জন্মিতে না পারে এরূপ নহে; কিন্তু তাহার লক্ষণ ত এখনও দৃষ্ট হইতেছে না, তারপর যে সকল সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাদেরই বা স্থায়ীত্ব বা ক্রমোন্নতির আশা কি ? প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মহৎ. প্রত্যেক কার্য্যই সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের

মূলে সমগ্র দেশের সহানুভূতি কিংবা সমগ্র জাতির শক্তি বল আছে? কেহ জাতীয় শিক্ষাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তৎপ্রতি স্বীয় বল বীর্য্য ন্যস্ত করিতেছেন, কেহ বা বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছেন; কেহ রাজনীতিকে মূল মন্ত্ররূপে জপ করিতেছেন, কেহ বা সমাজ সংস্কার জন্য জ্ঞানবল, অর্থবল ঢালিতে অনুরোধ করিতেছেন, আবার অনেকেই আপনাপন অনুষ্ঠানকে একমাত্র মুক্তিমার্গ মনে করিয়া অন্য অনুষ্ঠানের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। উল্লিখিতরূপ শক্তি সমবায়ে অনুষ্ঠানের সমবায় হইলে পরস্পর দ্বেষ, হিংসা আত্মকলহ ইত্যাদি সমস্ত অন্তরায় অপসারিত হইয়া যৌগিক বলে প্রত্যেক অনুষ্ঠান পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তখন জাতীয় সমগ্র সহানুভূতি, সাহায্য এবং শক্তি প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করিবে এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠান স্থির ও দৃঢ় ভাবে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। এইরূপ সমবায়ে যে কোন অসুবিধা বা আশঙ্কা থাকিতে পারে তাহা দূরীকরণ জন্য যে যে অনুষ্ঠানের যে যে মূল ধন আছে তাহা স্বতন্ত্র থাকুক এবং যে যে অনুষ্ঠানের যে যে প্রবর্ত্তক আছেন, তাঁহারা আপন আপন ক্ষেত্রে কর্ম্মকর্ত্তারূপে বিদ্যমান থাকুন, কেবল সমস্ত কার্য্য এক কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হউক, তাহা হইলে প্রত্যেক শাখানুষ্ঠানে কেন্দ্রস্থিত জাতীয় বল বীর্য্য প্রসারিত হইবে, সমগ্র দেশের জ্ঞানবল, অর্থবল এবং চিন্তাবল একত্রিত হইয়া মহা শক্তির উৎপত্তি হইবে এবং সেই শক্তিই বর্ত্তমান ভীষণ সঙ্ঘর্ষের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে সক্ষম হইবে। নতুবা বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন দুর্গই এ সংগ্রামে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে না।

শক্তির সঞ্চয় সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গলায় বার আনি লোক এখনও তমসাচ্ছন্ন, জাতীয় ভাব গ্রহণে সম্পূর্ণ অনধিকারী, তাহারাই জাতীয় বলের আধার, আমি বক্তৃতার অপকৃষ্টতা ঘোষণা করিতে চাহি না, কিন্তু কেবল বক্তৃতায় তাহাদের চৈতন্যোদয় হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল, যাহা অস্বাভাবিক তাহা সর্ব্বত্রই অসম্ভব এ স্থলেও যে জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার একান্ত প্রয়োজন। এই শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি চির প্রচলিত অমানুষিক, কঠোর সামাজিক নিয়মেরও শিথিলতা সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক। সন্দেহ নাই, রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় সামাজিক বিপ্লবেরও বিপদ অনেক। কিন্তু যদি জাতীয় একতা সম্পাদন করিতে হয় তাহা হইলে চিরদিন গণ্ডীর মধ্যে বাস করিলে চলিবে না। সহানুভূতি পাইতে হইলে সমবেদনা দেখাইতে হইবে, সাহায্য প্রার্থী হইলে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। যে সকল নিরক্ষর জাতি এত দিন সমাজের উপকণ্ঠে বাস করিয়া কেবল সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, যাহারা বিপদে সম্পদে চির দিন শিক্ষিত সমাজের ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছে তাহাদের উন্নতির পথ চির অবরুদ্ধ রাখিয়া কতকাল গৃহে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে? এখনও দ্বার খোল। গৃহ মধ্যে না হউক অন্ততঃ গৃহ প্রাঙ্গণে তাহাদিগকে স্থান দাও।

এইরূপে শক্তি সঞ্চয় এবং সঞ্চিত শক্তির সমবায় হইলে বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্যাবধারণের জন্য বোধ হয় ব্যাকুল হইতে হইবে না। ঠিক বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ভেদ ও দমন নীতি অবলম্বনে কর্ত্তৃপক্ষগণ শান্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা যেমন ব্যর্থ হইবে, কেবল লাঠী ভর করিয়া যাহারা দাঁড়াইতে চাহিতেছেন তাহাদের উদ্যমও সেইরূপ

ফলদায়ক হইবে। এ সংগ্রামে অযথা বলপ্রকাশ সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য, শুনিয়া সুখী হইলাম যাঁহারা এই নীতির প্রচারকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাহ্বাস্ফোটন করিয়াছিলেন তাহাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে এবং তাঁহারা মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মকলহে বলক্ষয় এবং বল প্রকাশে কার্য্য হানি হইবে, জোর করিয়া দেশ বাৎসল্য শিক্ষা দানের কিংবা স্বদেশী আন্দোলনের বল বৃদ্ধির চেষ্টা যেমন হাস্যজনক, তাহার ফলও সেইরূপ বিপরীত ও বিষময় হইবে। শিক্ষা সদুপদেশ, সামাজিক শাসন প্রভৃতি সদুপায়ে যতদূর সফলতা লাভ করা হইয়াছে, বলপ্রকাশ দ্বারা এপর্য্যন্ত তদপেক্ষা এক পদও কেহ অগ্রসর হইতে পারেন নাই, বরং স্থান বিশেষে পদস্খলন হইয়া অনেককে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছে। সৎসাহস সর্ব্বত্রই স্পৃহনীয়; কর্ত্তব্য জ্ঞানে নির্ভীক হৃদয়ে দেশের কল্যাণ কামনায় যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত কর্ম্মবীর, কর্ত্তব্যানুরোধে বিপদকে আলিঙ্গন করায় বীরত্ব আছে কিন্তু দণ্ড ভরে বিপদকে আহ্বান করা মূঢ়তার কার্য্য! জেলে যাইতে হইলে অবিচলিত চিত্তে প্রবেশ করিতে হইবে; কিন্তু জেলে যাইব বলিয়া জেলে গমন করিলে দেশের কোনই উপকার হইবে না। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর প্রতীক্ষায় জেলের জন্য অনন্তকাল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও জেলের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। কেহ কেহ বলেন কিছু কালের জন্য অথবা আগামী তিন মাসের জন্য সকল আন্দোলন বন্ধ রাখিলেই সকল উৎপাতের শান্তি হইবে। এ শান্তি দুই প্রকারে হইতে পারে;— এবং তিন মাস কাল নীরব থাকিলে আর এ জাতির সাড়াশব্দ শুনিতে হইবে না, সুতরাং সর্ব্বত্র নীরব শান্তি বিরাজমান হইবে, দ্বিতীয়তঃ আমরা তিন মাস কাল (তিন মাসের মধ্যে কি তাৎপর্য্য আছে

ভাঙ্গা জানা না) নীরব থাকিলে রাজশক্তি অস্থির হইয়া প্রজা শক্তির মানভঞ্জন করিতে আপনা হইতেই আগমন করিবেন, সুতরাং তাহাতেও আবার সন্ধি বা শান্তিস্থাপন হইতে পারে! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল পথের প্রশস্ততা কিছুমাত্র উপলব্ধি হইতেছে না। আমরা অভিমানপূর্ব্বক বর্ম্ম চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শিবির প্রবেশ করিলে যে বিপক্ষ ভীত হইবেন এ যুক্তিতে সারবত্তা থাকিতে পারে; কিন্তু আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি না, বরং এই নীতি অনুসরণ করিলে প্রথমোক্ত শান্তি আবির্ভাবের আশঙ্কাই আমার মনে অধিকতর উদয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্টও তাহাই চাহিতেছেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার।

(২)

রাজনৈতিক আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন চারিদিকেই তুমুল ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, এবং কোন কোন স্থানে প্রলয়ের আরম্ভ ও ঘটিয়াছে, আমাদিগের ক্ষুদ্র জাতীয় জীবন-তরি বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র তরিখানি নিরাপদে রক্ষা করিতে কর্ণধারগণের বিশেষ সাহস, ধৈর্য্য, উদ্যম ও উৎসাহ প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। এই ত ভীষণ পরীক্ষার সময়। অনুকূল বাতাসে, পাল তুলিয়া চলিয়া যাওয়া বড়ই আনন্দ ও আরাম জনক হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মাঝির বিশেষ কিছু গৌরবের কারণ নাই। কিন্তু যিনি প্রচণ্ড বাত্যা-বিতাড়িত তরণী খানি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে পঁহুছাইতে পারেন, তিনিই কর্ণধার। পরাধীন জাতির 'অধিকার' লাভের চেষ্টাই রাজার সহিত বিরোধ; সুতরাং এক্ষেত্রে যে আমরা 'স্বরাজ ও বয়কট' ঘোষণা করিয়া, ইংরেজ রাজশক্তির সংঘর্ষে নিষ্পেষিত হইব, অথবা হইবার আশঙ্কা

থাকিবে, ইহা নিশ্চিত! ইহা বুঝিয়া শুনিয়াই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ সংযম, সাবধানতা ও সাহসকে আশ্রয় না করিলে, এই বিকাশোন্মুখ জাতীয় জীবন, অচিরে বিনষ্ট হইবে। ইংরেজ-রাজ যে প্রকারে 'স্বদেশী' ও রাজনৈতিক আন্দোলন দমন ও নষ্ট করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ চেষ্টা না করিলে, এই সাধের তরি আর রক্ষা পায় না। আমরা আমাদের শক্তির ইয়ত্তা না করিয়া, অনেক হাক্, ডাক্ ছাড়িয়াছি। সমস্ত দেশের লোক প্রস্তুত না হইলে যে 'বয়কট্' অসম্ভব, তাহা চতুর গবর্ণমেণ্ট একচালেই দেখাইয়া দিয়াছেন। কেমন সহজে, শান্ত ও চির সৌহার্দ্দ-বন্ধনে-বদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানে কলহ উৎপাদন করিয়া 'বয়কটের' তেজ পরিম্লান করিয়াছেন; যাহা আইনের সাহায্যে পারিতেন না, তাহা আমাদের দ্বারাই সম্পন্ন করিলেন। জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার ও স্বদেশপ্রীতি উদ্রেক করিবার পূর্ব্বে বোধ হয় আশানুরূপ ফল লাভ হইতে পারে না। নির্ব্বাসন, কারাবাস প্রভৃতি স্বদেশ হিতৈষীদিগের অলঙ্কার। কিন্তু এদেশে এখনও এমন দিন উপস্থিত হয় নাই, যে একজন লাজপত রায় নির্ব্বাসিত হওয়াতে, শত শত লাজপত রায় দেশের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইবে। কাজেই আমাদের একটু হিসাব করিয়া চলা উচিত। আমাদের শক্তি কম, সঞ্চয় কম, ব্যয়বাহুল্যে আমরা নিরন্ন ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িব। বল সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই বলক্ষয়-কারী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া, বোধহয় বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। কয়েকজন নেতাকে নির্ব্বাসিত ও লাঞ্ছিত করিলে, এবং একটু পাশব বলের বিভীষিকা প্রদর্শন করিলেই এ দেশের আন্দোলন থামিয়া যাইবে, রাজ-পুরুষদিগের এই বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যে একান্ত মূলহীন ইহাও বলিতে

পারি না। সুতরাং, বল সঞ্চয়ের পূর্ব্বে, আমাদের পক্ষে দেশটাকে "শব্দায়মান" করিয়া রাজপুরুষদিগের শান্তিভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কিছু প্রকৃত কাজ, তাহা নীরবেই সম্পাদিত হয়। সমস্ত ব্যাপারের মূল ভিত্তিই লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত থাকে। লোক শিক্ষার জন্য সভাসমিতি ও বক্তৃতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল তাহাতেই আন্দোলন নিবদ্ধ রাখিলে, সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত কঠোর রাজ-বিধি দ্বারা 'স্বদেশী' দলনের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে কিছু কালের জন্য আমাদের শান্ত ও সংযত হইয়া প্রকৃত কাজে অভিনিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিধি মত চেষ্টা করা আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য, স্বাস্থ্য রক্ষা, সাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় গুলি সর্ব্বতোভাবে আমাদের অনুধ্যেয় হউক্। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান তিরোহিত হউক্। শরীর বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ করিবার উপায় সমূহ অবলম্বিত হউক্। আর রাজবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া, যতদূর সম্ভব আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাই বলবতী হউক্। রাজবিধি তখনই উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে যখন প্রজাশক্তি, রাজশক্তির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে পারিব। সে দিন এখনও বহুদূরে। অযথা বাগাড়াম্বর সর্ব্বথা পরিহার করিতে হইবে। অনেকে ইহাতে ভয় ও কাপুরুষতার চিহ্ন পাইবেন, বাস্তবিক সংযম ও স্থৈর্য্য কাপুরুষতা নয়, দেশের সমস্ত বা অধিক সংখ্যক লোককে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে না পারিলে, জন কয়েক লোক এগিয়ে পড়িলে, বিপদই আসিবে। আমাদের দলবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এখনও জন্মে নাই। সেই ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কেবল কথার ব্যবসায়ে চলিবে না।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

৩

টৌকিও-নগরে, শিবাজি-উৎসব সভায়, "জাপান-ভারত-সমাজের" সভাপতি কৌণ্টওকুমা তাঁহার বক্তৃতায় একটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অতীব সারগর্ভ। কথাগুলি এই :—

* "দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দেশের-লোকের আত্মচেতনার উদ্রেক হওয়া আবশ্যক, এবং আজকাল ভারতের যে উচ্চ আকাঙ্খা জন্মিয়াছে তাহা পূর্ণ করিতে হইলে, নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভারতের ভাগ্য বিধাতা ভারত নিজেই। আভ্যন্তরিক অবস্থা নিতান্ত দূষিত না হইলে কোন প্রবল বিদেশী রাজশক্তি অপর দেশকে জয় করিতে কখনই সমর্থ হয় না;—এই অর্থে রোম নিজের দ্বারাই নিজে পরাভূত হইয়াছিল। কোন দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা দূষিত হইলে সহজেই সে দেশ অন্যের কবলে পতিত হয়!"

সে দিন জামালপুরে যে শোচনীয় ও লজ্জাজনক ঘটনা হইয়া গেল তাহাতে আমাদের অপদার্থতা ও হীনতা সম্বন্ধে এখনও কি আত্ম-চেতনার উদ্রেক হয় নাই?

অতএব, এখন বাগাড়ম্বর ও মুখের আস্ফালন ছাড়িয়া দিয়া, যাহাতে আমাদের শরীর মন আত্মার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়, সমাজের যে সকল দোস আমাদের জাতীয় উন্নতির অন্তরায় সেই সকল দোষ যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয়, জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র যাহাতে উন্নত আদর্শে গঠিত হয়, সেই দিকে আমাদের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা নিয়োগ করা আবশ্যক। কিছুকালের জন্য হৈ চৈ ছাড়িয়া দিয়া, নীরবে সাধনা করিতে হইবে, বিরলে কঠোর তপস্যা

* Japan Times.

করিতে হইবে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে, অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। আমরা এখন আপনাদেরই পাপের ফল ভোগ করিতেছি। তপস্যায় পাপক্ষয় হইলে তবে আমরা পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইব, সৌভাগ্যলক্ষ্মী আবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্বেতদিগের পীতাতঙ্ক।

কিছু দিন পূর্ব্বে যখন চীনদেশ আভ্যন্তরীণ উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শ্বেতজাতিরা ইহাই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, চীন-মৃগের মৃত্যু আসন্ন। এখন উহার কোন্ অংশ, কাহার ভাগে পড়িবে, তাহাই কেবল বিবেচ্য। ইহা বেশী দিনের কথা নহে।

আজ ইউরোপের এক প্রবল পরাক্রমশালী শ্বেতজাতীয় রাজ-শক্তিকে এসিয়ার এক ক্ষুদ্র দেশের পীত জাতীয় রাজ-শক্তির কাছে, ফুৎকারে জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইতে দেখিয়া, অমনি অন্যান্য শ্বেতজাতিদিগের চমক ভাঙ্গিয়া গেল! যাঁহারা নিজেদের আত্মগরিমায় অন্ধ প্রায় হইয়া এই কিছু দিন পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, তাঁহারাই অর্থাৎ শ্বেতজাতিই সসাগরা ভুনিয়ার ভবিষ্য মালিক, আজ ক্ষুদ্র জাপানের এই অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব বীরপনা ও গুণগ্রাম দেখিয়া তাঁহাদের সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন জাপানের কীর্ত্তিকাণ্ড দেখিয়া, তাঁহারা চীনেরও নানা বিষয়ে গুণপনা স্বীকার

করিতেছেন এবং ইহাই ভাবিতেছেন যে—"জাপান যেন ক্ষুদ্র—চীনত ক্ষুদ্র নহে! এই বৃহৎ চীনজাতি যদি "পা ঝাড়িয়া" উঠে, জাপানের দেখিয়া চীনও যদি সেই পথে উন্নতির চেষ্টা করে, তবেত সর্ব্বনাশ—ছদিনের মধ্যেই ত পীত জাতিই পৃথিবীতে প্রধান হইয়া উঠিবে।"—চীনেরা যে ভিতরে ভিতরে নানা গুণ-সম্পন্ন, চীনেরা যে কর্ম্মঠ জাতি, চীনেরা যে স্বদেশ-ও-স্বজাতিপ্রিয় জাতি,—এখন হঠাৎ তাঁহারা এসকলই অনুভব করিতেছেন! সুতরাং এত গুণ যখন বিদ্যমান, তখন জাপানের উদাহরণে চীনের উন্নতি স্বল্পায়াস-সাধ্য এবং স্বল্প কালেই তাহা হইতে পারে। সম্প্রতি এই প্রকারের এক প্রকাণ্ড ভাবনা-কীট শ্বেতাঙ্গ-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। বিলাতের "স্পেকটেটার" পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রই তাহার প্রমাণ। পত্রখানি অতি সুচিন্তিত ও সুযুক্তি পূর্ণ। উহাতে বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। তাই, নিম্নে তাহার সার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল। পত্রখানিতে শ্বেতজাতির উল্লিখিত ভাবনার বিষয় অতি অকুণ্ঠিত চিত্তে ও সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"পীতজাতির উত্থান।"

"পীতজাতির এক অংশ (জাপান) এক শ্বেতজাতির (রুষিয়ার) সহিত জলে স্থলে অতি সুন্দররূপে যুদ্ধ চালাইল দেখিয়া, শ্বেতজাতি-দের মধ্যে কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন যে যদি ঐ পীতজাতিই সর্ব্বশেষে জয়ী হয়, তাহা হইলে উহার ফলে সমগ্র পীতজাতি সমবেত ভাবে সশস্ত্র হইয়া সমগ্র শ্বেতজাতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবে, ইহা নিশ্চয়। শ্বেতজাতিরা "পীতোৎপাত" নাম দিয়া এই ভাবনার ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। আমি এই যে পীতজাতির উত্থানের বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, ইহা উপরের কথিত "সশস্ত্র

উত্থান" নহে, অর্থাৎ উপস্থিত রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ে উৎসাহিত হইয়া সমগ্র শ্বেতজাতির ধ্বংস-কল্পে সমগ্র পীতজাতির "সশস্ত্র উত্থান নহে;—আমার কথিতব্য "পীতজাতির উত্থান" অর্থে উন্নতিকল্পে পীতজাতির উত্থান অর্থাৎ পৃথিবীতে মনুষ্যের প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে যে বিবর্ত্তন-ঘটিত উন্নতির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, যাহা দ্বারা আজ এক জাতির উত্থান, কাল তাহা অপেক্ষা অধিক গুণশালী আর এক জাতির উত্থান, পরশ্ব আবার তাহার অপেক্ষাও অধিক গুণশালী তৃতীয় এক জাতির উত্থান,—এইরূপে পৃথিবীতে গুণশালীর জয় ও উত্থান এবং গুণহীনের ক্ষয় ও পতনরূপ যে এক বিরাট বিবর্ত্তন ব্যাপার যুগের পর যুগ ধরিয়া সংঘটিত হইয়া আসিতেছে. আমার বক্তব্য বিষয় এই বিবর্ত্তন ঘটিত গুণশালী পীতজাতির জয় ও উত্থান সম্বন্ধে। এস্থলে মনে রাখা উচিত যে উপস্থিত রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপান রুষের বিরুদ্ধে "সশস্ত্র-উত্থান" করে নাই,—রুষই প্রথম-আক্রমণকারী; জাপান কেবল আত্মরক্ষার অর্থাৎ নিজের জাতীয় জীবন ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ব্যস্ত মাত্র।

যে কাল হইতে মনুষ্যের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, সেই কাল হইতেই পৃথিবীর নানা স্থানের নানা জাতি মোটামুটি পাঁচ বর্ণে বিভক্ত;—রক্ত, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, ও কটা। বিবর্ত্তন ব্যাপারে এই কয় বর্ণের মধ্যে পরস্পর কাড়াকাড়ি, "খেয়োখেয়ী" করিয়া, ইহারই মধ্যে কোনও না-কোনও বর্ণ অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গুণ সম্পন্ন—সেই বর্ণই পৃথিবীর একেশ্বর হইবে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মানব সমষ্টি সর্ব্ব প্রথমে একত্র ও একবর্ণ ছিল কি না, এবং ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্যাপ্তি-নিবন্ধন দেশ-ভেদে বহু যুগে বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে কি না?—কিম্বা এক এক বর্ণের

মানবসমষ্টি প্রথম হইতেই সেই সেই বর্ণ ও তাহার সহিত অন্যান্য বিশেষত্ব সম্পন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত কি না? —এই উভয় তত্ত্বই আনুমানিক মাত্র। তবে যে মধ্য এসিয়ার স্থান বিশেষকে "মনুষ্য জাতির প্রথম আবাসস্থল" বলা হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত পক্ষে "সভ্যতার আদি স্থান" এতদ্রূপই বলা উচিত। কথিত দুই প্রকার অনুমানের মধ্যে শেষোক্ত অনুমানের পক্ষে, অর্থাৎ "এক এক বর্ণের মানব সমষ্টি প্রথম হইতে সেই বর্ণ ও অন্যান্য বিশেষত্ব সম্পন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত এই অনুমানের পক্ষে একটি ভাল প্রমাণ এই দেওয়া যাইতে পারে যে, ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মানব সমষ্টির মধ্যে পরস্পর এমন একটা মজ্জাগত বিদ্বেষভাব সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়, যাহা দ্বারা উহার মধ্যে কোনও বর্ণ নিজ নিজ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া, অন্যান্য বর্ণের সহিত কোনও মতে একত্রে বাস করিতে পারে না। যেখানেই দুই বর্ণের একত্র সংস্পর্শ ঘটে, সেই স্থানেই দেখা যায় যে একবর্ণ অন্য বর্ণকে হয় একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে, কিম্বা বিদূরিত করে; না হয় একবর্ণ অন্য বর্ণের সহিত মিশিয়া দুয়ে মিলিয়া একাকার হয়, আর না হয় (যেমন ভারতবর্ষে) একবর্ণ পৃথক ভাবে থাকিয়া কিছুকালের নিমিত্ত অন্য বর্ণের উপর আধিপত্য করে।

এখন দেখা যাউক ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস হইতে এই বিষয়ে আমরা কি শিক্ষা পাই। উত্তর আমেরিকা দেশে শ্বেত বর্ণের সংস্পর্শে তথাকার আদিম রক্তবর্ণ জাতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকাতেও ঐরূপ, তবে তথায় নানা বর্ণের সংমিশ্রণে এক প্রকার "কটা" জাতি এখনও বিদ্যমান আছে—(বলিয়া রাখি, সেখানকার এই কটা জাতি নিজেদিগকে "শ্বেত" বলিয়া পরিচয় দেয়)।

আফ্রিকার নিগ্রোজাতি যাহারা আমেরিকায় নীত হইয়াছে এবং তথায় বসবাস করিতেছে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ কি, ইহা বলা সহজ নহে। তবে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে যেন ইহাই ইঙ্গিত করে যে, হয় তাহারা নষ্ট হইয়া যাইবে, আর না হয় তাহারা সেখান হইতে বিদূরিত হইবে। তৃতীয় পন্থার, অর্থাৎ শ্বেতদিগের সহিত মিশিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই; কারণ, শ্বেত চরিত্র ও শ্বেতদিগের বর্ণান্তরের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ এরূপ যে উহা বর্ণান্তরের সহিত সংমিশ্রণের পক্ষে একেবারেই প্রতিকূল। আফ্রিকা মহাদেশের যতখানি স্থলে শ্বেতবর্ণের প্রাদুর্ভাব, ততখানির মধ্যে তথাকার আদিম কৃষ্ণবর্ণ জাতি ক্রমেই কম হইয়া পড়িতেছে, শ্বেতবর্ণ তাহাদিগের স্থানে ক্রমশই বাড়িতেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে শ্বেতবর্ণের সংস্পর্শে সেখানকার আদিম কৃষ্ণবর্ণ জাতির প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; যে কয়েক দল মাত্র অসভ্য জাতি এখনও বিদ্যমান, তাহারাও শীঘ্র নির্ম্মূল হইল বলিয়া। কটা জাতি কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা বেশী "টেঁকসই"। শ্বেতের সংঘর্ষে ও উপদ্রবে আজও কটা জাতি টিঁকিয়া আছে, সে শুধু এই কারণে যে, যে সব স্থানে কটা জাতির বাস, সে সকল স্থান শ্বেতবর্ণের স্থায়ী বাসের উপযোগী নহে। যে সকল স্থান শ্বেতাঙ্গের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী, সেই সকল স্থলেই কেবল শ্বেতবর্ণ অন্যবর্ণকে দূর করিয়া, তাহাদিগের স্থান লইতে সক্ষম হয়। কটা ও রক্তবর্ণের সহিত শ্বেতের সংঘর্ষে যে যে স্থান শ্বেতের বাসোপযোগী, অর্থাৎ যেখানে শ্বেতবর্ণ সুস্থ থাকিতে পারে, পরিশ্রম করিতে পারে এবং তাহাদের সন্তানেরা সুস্থ থাকে ও সবল হয়, শুধু সেই সেই স্থানেই শ্বেতবর্ণ অন্যান্য বর্ণকে বিদূরিত করিয়া একেশ্বর হইয়াছে। এই জন্য ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে শ্বেতবর্ণের প্রাধান্য ও

আধিপত্য ক্রমশঃ বাড়িয়া, এখন সেখানকার রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও কটাবর্ণ জাতি সকল, কোথায়ও লুপ্তপ্রায় কোথায়ও বা ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এসিয়া খণ্ডের ব্যাপার অন্যরূপ। সেখানে যদিও অনেক দেশে শ্বেতবর্ণ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া শাসনকার্য্য চালাইতেছে,—কিন্তু কোথাও হইতে দেশীয়দিগকে বিদূরিত করিতে পারে নাই;—কারণ, সে সব দেশে দেশীয় লোকের সহায়তা ভিন্ন শ্বেতবর্ণের কাজ চলে না, অথচ সে সব কাজে-শ্বেতবর্ণ নিজেও করিতে পারে না। প্রাচ্যখণ্ড বাস্তবিক শ্বেতবর্ণের বাসোপযোগী দেশ নহে। সেখানে শ্বেতবর্ণ আসে আর যায় মাত্র, কিন্তু কোনও মতে "শিকড় গাড়িতে" পারে না। এই প্রাচ্য খণ্ডেই এই সর্ব্ব প্রথম শ্বেতে ও পীতে সুমহান্ সংঘর্ষ সমুপস্থিত এবং ইহাতে শ্বেতের যে বড় সুবিধা হইয়াছে তাহাও নহে। ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে শ্বেতবর্ণ যেমন অন্যান্য বর্ণের ধ্বংস সাধন করিয়া নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, প্রাচ্যখণ্ডে তেমনি পীতজাতি যখনই নিজের নিস্পন্দতা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে, তখনই বর্ণান্তরের সহিত সংঘর্ষে ঐ পীতজাতিই নিজের প্রাধান্য ও নিজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতে ভবিষ্য প্রাধান্য বুঝিতে হইবে, শ্বেত ও পীত এই দুই বর্ণের মধ্যে কাঁহারও, অর্থাৎ এই বর্ণ প্রাধান্য ব্যাপারে, হয় শ্বেত, না হয়-পীত, জয়ী হইয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবে।

সিঙ্গাপুর ও পিনাং, এই দুই স্থান এক প্রকার চীনদিগের বলিলেও চলে। মলয় রাজ্যে দোকান পাট ও খনির কাজ সবই চীনেদের হাতে এবং সেখানে চীনেরা অতি দ্রুতভাবে লাভোপযোগী জমী সকল লইয়া বসিতেছে, আর মলয়বাসীরা অলস, নিশ্চেষ্ট ও দাম্ভিকের

ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছে এবং অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেমন ভারতে তেমনি এই মলয় প্রদেশে শ্বেতাঙ্গদল কেবল শাসন করেন মাত্র, কিন্তু জমির মালিক নহেন। পীত বর্ণেরাই ক্রমশঃ বেশী বেশী জমির "জমিদার" হইয়া উঠিতেছে এবং শীঘ্রই যে শাসনের ভারও চাপিয়া বসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনদেশ, যাহা বস্তুত পীত জাতির আবাস ভূমি, বহু যুগ ধরিয়া প্রতীচ্য সভ্যতার হিসাবে নিদ্রিত ছিল বলা যায়, কিন্তু সে চীন দেশের নিদ্রাভঙ্গ হইতে আর দেরী নাই। পীত বর্ণেরই এক শাখা—জাপান এক পুরুষের মধ্যেই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে এবং জাগ্রত হইয়াই কিছু কার্য্য সাধন না করিয়াছে এমত নহে। ইহা এক ঐতিহাসিক সাধারণ কথা যে, যে জাতি যেরূপ শাসন প্রণালীর উপযুক্ত, সে জাতি সেইরূপ শাসন প্রণালীই পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে ঐরূপ শাসন প্রণালীই সেই জাতির অভাব মোচনে সমর্থ বা উহাই তাহাদের বাঞ্ছনীয়। যেথানে দেখা যায় লোকে কদর্য্য শাসন প্রণালীর অধীনত্ব স্বীকার করিয়া চলিতেছে, সেখানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে তাহারা এরূপ শিক্ষিত হয় নাই যে একটা সমবেত চেষ্টা করিয়া কদর্য্য শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করে। বিবর্ত্তন প্রণালীর নিয়মানুসারে যেমন ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি ও পরিণতি ক্রমশঃ সাধিত হইতেছে, শাসনপ্রণালীও সেই বিবর্ত্তন নিয়মের অন্তর্গত। সচরাচর এইরূপ দেখা যায় যে শাসন ব্যাপারে উন্নতির ইচ্ছা প্রথমে ব্যক্তিগত থাকে, ক্রমে ঐ ইচ্ছা লোকসমাজে অর্থাৎ প্রজাসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, পরে ঐ ইচ্ছা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া সমবেত প্রজাসমাজ রাজশক্তিকে তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। এই যে শাসন প্রণালী ব্যাপারে

উন্নতির ইচ্ছা, যাহা প্রথমে ব্যক্তিগত মাত্র, ঐ ব্যক্তি সমাজের ঊর্দ্ধস্তরের হইতেও পারেন, বা অধঃস্তরেরও হইতে পারেন। সে ব্যক্তি হয়ত শাসক সম্প্রদায়ের একজন অথবা প্রজাসমাজের উচ্চ স্তরের একজন; আর না-হয়-ত সেই ব্যক্তি এক গরিব কৃষক মাত্র, যাহার মনে নিজের এবং দেশের অন্যান্য সকলের উন্নতির ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে। যদি উচ্চস্তরে এই উন্নতির ইচ্ছা আরম্ভ হয়, তবে সেই ইচ্ছা প্রণোদিত আন্দোলন শীঘ্রই কার্য্যকর হইয়া থাকে, যেরূপ জাপানে হইয়াছে;—আর যদি ঐ ইচ্ছা প্রজা সমাজের নিম্নস্তরে উদ্ভূত হয়, যাহা এখন চীন দেশে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহার কার্য্য ধীরে হইবে বটে, গোপনে হইবে বটে, রহিয়া রহিয়া হইবে বটে, এবং উহার সাধন পথ মধ্যে মধ্যে কিছু কালের জন্য ধ্বংস ও বিনাশ দ্বারা কলুষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে ঐ ইচ্ছা ফলবতী হইবেই হইবে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। √চীনদেশে শাসন প্রণালীর উন্নতির জন্য প্রজা সমাজে এক প্রকার ব্যাকুলতা লক্ষিত হইতেছে। চীন সমাজ বড়ই রক্ষণশীল, এবং উহার উন্নতির গতি মন্থর। কিন্তু ইহাকে এই-ই বুঝা যায় যে যেটুকু উন্নতি সাধিত হয়, তাহাই সবিশেষ কার্য্যকর ও সুদীর্ঘ স্থায়ী। আজ কাল সকল জাতির মধ্যেই শাসন প্রণালীর উন্নতির জন্য সবিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে। এমত স্থলে শুধু চীনই যে চিরকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—বিশেষ উহারই সবর্ণ জাপান সম্প্রতি যে কাণ্ড করিয়া তুলিল, ইহা দেখিয়াও চীন যে চিরকালই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা ভাবাই উচিত নয়। যে জাপানকে নগণ্য বোধে চীন ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সেই জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার সার গ্রহণ করিয়া এবং তাহা কার্য্যে লাগাইয়া এখন এত বড় হইয়া

উঠিয়াছে যে আজ ঐ জাপান পৃথিবীর কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর রাজশক্তির মধ্যে একটি বলিয়া পরিগণিত। দুর্দ্দান্ত ও ভয়ঙ্কর রুষশক্তিকে জলে ও স্থলে বিধ্বস্ত করিয়া আজ ঐ জাপান পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি রাজ শক্তির মধ্যে একটি বলিয়া পরিগণিত। চীন ইহা বুঝিবেই বুঝিবে। চীন জাতিকে যাহারা জানে তাহারাই বুঝে যে ঐ জাতির মধ্যে এখনও কতটা ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং ঐ ক্ষমতার বলেই চীন জাতির সম্মুখে এক বিশাল ভবিষ্যৎ বিদ্যমান।

আমেরিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার চীন বহিস্করণ সম্বন্ধীয় আইন হইতেই তথাকার শ্বেতবর্ণ কর্ত্তৃপক্ষদিগের পীতাতঙ্ক প্রকাশ পাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতবর্ণেরা কৃষ্ণবর্ণকে বিদূরিত করিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ কৃষ্ণবর্ণেরা যে সকল কাজ করিত, সে সকল কাজ শ্বেতবর্ণ নিজেরা করিতে পারিতেছে না। সেই জন্য এখন পীতবর্ণ (চীন) দিগকে সেখানে ডাকিয়া লইয়াছে। আপাততঃ চীনদিগকে কতক গুলি নিয়মাধীন হইয়া তবে সেখানে যাইতে হয়; যথা;—কেহ খনির কাজ ছাড়া অপর কোনও কাজ করিতে পারিবে না;—বাসের নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাহিরে কেহ যাইতে পারিবে না; এবং চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইলে কেহ সেই দেশে বসবাস করিতে পারিবে না। চুক্তির শেষে তাহাদিগকে চীন দেশে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার নিয়মের বাঁধাবাধি ও কড়া-কড়ি হইতে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেত হৃদয়ে সেই পীতাতঙ্ক বিরাজমান, দক্ষিণ আফ্রিকায়ও শ্বেত হৃদয়ে সেই পীতাতঙ্ক বিরাজ করিতেছে। এ সকল বাঁধাবাধি নিয়ম কত দিন কার্য্যকর থাকিবে? ঠিক ততদিনই মাত্র, যতদিন চীনেরা ঐ

সকল নিয়মের অধীন থাকিতে ইচ্ছা করে। এখন তাহারা কেবল দেশের ভাবখানা "দেখিয়া শুনিয়া" নিতেছে মাত্র, এবং সেখানে এখন তাহারা সংখ্যারও কম। চীন দেশ তলে তলে গুপ্ত সমাজে অন্তর্ব্যাপ্ত এবং চীনেরা যে কিরূপ একতাসাধনক্ষম জাতি, তাহা যাহারা উহাদিগকে লইয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহারাই জানেন। দলে দলে চীনেরা এই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছে, উহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব গুপ্ত সমাজ ও ঐ একতাসাধনক্ষম গুণও অবশ্য যাইবে বই কি? যত দিন তাহারা সেখানে সংখ্যায় কম থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে নিয়মে বাঁধিয়া নিয়মাধীন রাখা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহারা সংখ্যায় পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ হইবে, এবং সেই লক্ষ লোক সম্মিলিত হইয়া "এক" হইয়া দাঁড়াইবে, তখন যদি তাহারা "নির্দ্দিষ্ট সীমানার" মধ্যে থাকিতে বা চুক্তি শেষে চীন দেশে ফিরিতে না চায়, তখন কেমন করিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে বাধা করা যাইবে, জানি না। রোমের যখন পত্তন পর্য্যন্তও সুরু হয় নাই, তখনও চীন দেশে এই সমপ্রকৃতি সম্পন্ন চীন জাতি বাস করিতেছিল এবং তখনও উহাদের মধ্যে এক প্রকার শাসন প্রণালীও বিদ্যমান ছিল এবং তখন উহাদিগের সভ্যতাও খুব সামান্য রকমের ছিল না। রোম এগার শতাব্দী কাল সতেজে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া পাশ্চাত্য জগতে একই মাত্র সাম্রাজ্যরূপে পরিণ্ণত হইয়াছিল। পরে, সেই রোমসাম্রাজ্য ক্ষয় হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহারই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশ সকল এখন ইউরোপীয় নানা জাতির সম্পত্তি। কিন্তু চীন—যে চীন সেই চীন—সেই সমপ্রকৃতি সম্পন্ন প্রজাপুঞ্জ লইয়া, সেই একতা সম্বদ্ধ অখণ্ড চীনসাম্রাজ্য আজও বিদ্যমান। সুদীর্ঘ অতীত ব্যাপিয়া এই যে চমৎকার অক্ষুণ্ণতা, ইহার

মধ্যেই চীনের ভবিষ্যতের আশাবীজ নিহিত রহিয়াছে। অসভ্যাবস্থা হইতে আধুনিক সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইউরোপীয় জাতিদিগের দুই হাজার বৎসর লাগিয়াছে। আর জাপান (পীত জাতির একটি শাখা মাত্র) ইউরোপের এই সুদীর্ঘব্যাপী, বহু আয়াসলব্ধ সভ্যতার উৎকৃষ্ট সারাংশ এক পুরুষেই গ্রহণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলিল। এরূপ শুনা যায় যে জাপানের যিনি উপস্থিত সম্রাট. তিনি যখন নাবালক ছিলেন, তখন তাঁহাকে সম্রাট উপযোগী শিক্ষার মধ্যে কেবল কৃত্রিম ফুল তৈয়ারি করিতেই শিখান হইয়াছিল। আজ তিনি মধ্য বয়স পার হইয়াছেন মাত্র, এই অল্পকাল মধ্যেই এখন তিনি এমন এক প্রজাতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত রাজশক্তির অধিকারী যে, আজ পাশ্চাত্য খণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও উন্নত সাম্রাজ্যও তাঁহার সহিত "কাঁধ মিলাইয়া" বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আহ্লাদিত। তাঁহার নৌ-শক্তির অতুল প্রভাবে আজ রুষিয়ার রাজ পতাকা চীন সমুদ্র হইতে বিতাড়িত। আর স্থলে জাপান সেনার রণ কৌশল, সমাবেশ ও চালনা শক্তি, যুদ্ধ করিবার ধরণ ধারণ, কার্য্য তৎপরতা, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ ও বীরত্ব, এবং আহতদিগের প্রতি যত্ন, চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার এমন চমৎকার বন্দোবস্ত যে সে সকল দেখিয়া শুনিয়া সমগ্র সভ্য জগৎ শত মুখে জাপানকে "ধন্য ধন্য" করিতেছে। জাপান কেবল মাত্র এক পুরুষ কালের মধ্যে এই যে বিরাট উন্নতি সাধন করিয়াছে, ইহার তুলনা ইতিহাসে নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ উন্নতি কোনও দেশে, কোনও জাতি, কোনও কালে করিতে পারে নাই। শুধু পীত শাখার তিন কোটি মাত্র লোকে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়া এই ফল দেখাইতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, যাঁহারা চীন জাতিকে জানেন তাঁহারা কি বলিতে সাহস

করেন যে, উঁহারা জাপানীদের অপেক্ষা শারীরিক বা মানসিক কোনও অংশে হীন-শক্তি সম্পন্ন? যদি তাহা না হয়, তবে যখন পঞ্চাশ কোটী চীন সন্তান তাহাদের আত্মীয় জাপানের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া সেই পথে চলিবে, তখন কি হইবে? চীনের উত্তর প্রান্তে কিছু কাল শ্বেত ও পীতে সংঘর্ষ হইয়াছিল, এবং সেই সংঘর্ষে তখন শ্বেতেরই সুবিধা হইয়াছিল বটে; কিন্তু শীঘ্রই স্রোত ফিরিল। আজ প্রবল প্রতাপ রুষ জারের প্রধান প্রধান সেনাপতি কর্তৃক চালিত রুষসেনা, আক্রমণকারী হইয়াও, পীতজাতি কর্তৃক লাঞ্ছিত ও হতাশ ভাবে বিতাড়িত হইল। ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার ছায়া পাত হয়—আজ দেখ, যাহার চক্ষু আছে—চক্ষু মেলিয়া দেখ—পীতজাতির ভাবী সমুত্থানের এই সব সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে।

শ্বেতজাতি সেই সব দেশেই বাঁচিতে পারে, যে সব দেশে উঁহারা অন্যান্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে, সমস্ত কাজ নিজেরা করিয়া লইতে পারে;—সেই সব দেশেই অর্থাৎ শীত প্রধান বা শীতোষ্ণ দেশ মধ্যেই শ্বেতজাতি দীর্ঘায়ু হয়, নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও সক্ষম হয়, নিজেদের অনুরূপ সবল ও সুস্থ সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং শ্বেতবর্ণ জাতিদিগের জীবিত স্থান অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ও সীমা নির্দ্দিষ্ট। এদিকে পীতবর্ণ জাতি, বলিতে কি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম—যে কোনও দেশেই হউক না কেন, সেখানে পীতজাতি পূর্ণমাত্রায় বাঁচিতে পারে, পূর্ণ মাত্রায় পরিশ্রম করিতে পারে, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে এবং নিজেদের অনুরূপ সন্তানোৎপাদনেও সক্ষম হয়। শীত প্রধান উত্তর মেরু প্রদেশেই হউক, বা তাপ প্রধান উষ্ণ কটি দেশেই হউক, পীতজাতি সর্ব্বত্র বাহ্যাবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য সুন্দর রূপে সংস্থাপন করিয়া

নয়। ইহার জন্য উহাদিগের শক্তি ও গুণও যথেষ্ট আছে। উহারা বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ, ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতাতপ-সহনক্ষম—“আট পিঠে” ও মিত-ব্যয়ী, অর্থাৎ ঘরবাড়ী করিয়া, স্ত্রী পুত্র লইয়া এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে হইলে যে সব গুণের প্রয়োজন, সে সব গুণ পীতজাতির এক প্রকার মজ্জাগত বলিলেও হয়। চীনেরা কোনও কালেই ভাল যোদ্ধা ছিল না। তাহারা যুদ্ধ কার্য্যের ভার অপরের উপর দিয়া, নিজেরা, সুখে সচ্ছন্দে চাষ বাস করিত। বাইবেলে আছে—“শান্ত ব্যক্তিরাই এই পৃথিবীর অধিকার পাবে।” সাধারণ ভাবে ইহার যে অভিপ্রায় বুঝা হইয়া থাকে, তাহার অপেক্ষাও বিস্তৃত ভাবে অভিপ্রায় বুঝা উচিত। চীনের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। টাইমুর ও জেঙ্গিস্ খাঁ, এবং অন্যান্য অনেকে চীন আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকার করিয়া রাখিতে পারে নাই। উহারা সংসারে “শান্ত ব্যক্তি” বলিয়া অবশ্যই গণ্য ছিল না, উহাদের সাম্রাজ্য কথিত কাহিনীর ন্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন পর্য্যন্তও নাই, আর চীনেরা ইতিহাসের প্রথমেও যেখানে ছিল, আজও সেইখানে বিরাজ করিতেছে। যুদ্ধ-কৌশল চীনেদের প্রকৃতিগত না হইলেও, কিন্তু গর্ডন সাহেবের “Ever Victorious Army” হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিক্ষা দিলে চীনদিগকে বেশ যোদ্ধা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, যোদ্ধার জাতি না হইলেও, তাহারা যে প্রাধান্যপর জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকায় বা অষ্ট্রেলিয়ায় চীন পুরুষ যদি শ্বেত রমণীকে বিবাহ করে, তবে সন্তানেরা কিন্তু পিতার তুল্য হইয়া উঠে ও পিতারই অনুসরণ করে, অথবা মলয় প্রদেশে যদি মলয় রমণীকে বিবাহ করে, কুত্রাপি মাতার অনুসরণ করে না। এসিয়ার উত্তর ও পশ্চিম হইতে একাল পর্য্যন্ত দলে দলে কত

সম্প্রদায়ই চীন দেশ আক্রমণ ও অধিকার করিল, কত পুরুষ ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী রাজা চীনের রাজসিংহাসনে বিরাজ করিল, কিন্তু চীন জাতির উপর এ সকলের স্থায়ী বা গভীর ফলাফল কিছুই হয় নাই যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা সাময়িক ও অগভীর মাত্র। চীনেরা বিদেশীয় ভাব ভঙ্গী, ধরণ ধারণ বা ভাষা কিছুই গ্রহণ বা অনুকরণ করে নাই। বরং বিদেশীরাই চীনেদের ভাব ও ভাষা অনুকরণ ও গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে তাহারা চীনবাসী অপেক্ষাও "বেশী চীনে" হইয়া পড়িয়াছে। যে সব "উড়ো" সম্প্রদায় দলের শত দল আসিয়া নানা সময়ে চীন আক্রমণ করিয়াছিল, কালে তাহারা সাগরে নদীর মত, চীনেদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই তাহারা সবই "চীন" হইয়া গিয়া আজ চীনে শুধু "চীন"ই বিদ্যমান। যিনিই চীন দেশে গিয়াছেন, তিনিই জানেন যে চীন দেশ ও চীন দেশের লোক, দুইই কেমন প্রবাসীর মনোহরণ করে, দুই-ই প্রবাসীর উপর কেমন সুন্দররূপে স্বীয় অধিকার বিস্তার করে। চীনের অগণ্য সন্তান চিরকালই কিছু বসিয়া থাকিবে না, আর চির-কালই পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা তাহাদের দেশে চীনেদের যাইতে নিষেধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। পৃথিবীর অধিকার লইয়া শেষ যুদ্ধ হবে, শ্বেতে আর পীতে। কিন্তু ইহা 'শস্ত্র যুদ্ধ' হইবে না, "শক্তি-যুদ্ধ" তবে যদি শ্বেতেরা শস্ত্র যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হয়েন (যেমন সম্প্রতি হইয়াছেন) সে স্বতন্ত্র কথা। ইহা কখনই নিরর্থক ঘটনা নহে যে, পৃথিবীতে শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ জাতিরা ক্রমেই সংখ্যায় কমিতেছে, আর পীত বর্ণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রথম মনুষ্যের আবির্ভাবের অগণ্য যুগ পূর্ব্ব হইতে এই পৃথিবী বিদ্যমান ছিল; —সেই প্রথম মনুষ্য কোথায় বাস করিত, তাহার বর্ণ কিরূপ ছিল, কে

বলিতে পারেন, আর মানব কুলের ধ্বংস হইয়া শেষ মনুষ্য অন্তর্ধান করার পরেও এই পৃথিবী অগণ্য যুগ বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু ঘটনা সমষ্টির ইঙ্গিতে যতদূর অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাতে তাহাই বোধ হয় যে, সেই শেষ মনুষ্য পীতবর্ণের।

কণ্ঠ-হার।

নিন্দা করিব না—আমার সহধর্ম্মিণী লোকটি নেহাত মন্দ নন, কিন্তু পিতৃগৃহের বংশ মর্য্যাদা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। আমার ঘরে আসিয়া তাঁকে অনেক অভাব সহ্য করিতে হইত, তিনিও অম্লান বদনে সকল সহ্য করিতেন, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহাকে কিছুতেই রাগ মানাইতে পারিলাম না। তিনি তাঁর পিতৃগৃহের ধনী আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী কিছুতেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন না। কারণ, তার উপযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কার তাঁহার কিছুই ছিল না। বিবাহের সময় যাহা পাইয়াছিলেন একবার আমার অসুখে তার সবই একে একে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

এবার কিন্তু আমারই অনেক অনুযোগ অনুরোধে তাঁহাকে তাঁর এক বিশেষ আত্মীয় গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে স্বীকৃত হইতে হইল। তাঁকে ত রাজী করিলাম, কিন্তু তারপর যাহা আরম্ভ হইল, তাহা কাগজে লিখিয়া প্রকাশ করা শক্ত। "একখানাও ভাল কাপড় নেই—কি পরে যা'ব—হাতে দুগাছ বালা, কাণে দুটো ইহুদী মাকড়ী, গহনার মধ্যে ত এই''—গৃহ মধ্যে অনুনাসিক স্বরে বারংবার "ইত্যাকার ধ্বনি" উঠিতে লাগিল। আমি অন্য উপায় না দেখিয়া

সকালে সকালে আহারাদি করিয়া আফিস রওনা হইলাম, মনে করিলাম এখনও ৪।৫ দিন দেরী আছে—ইতিমধ্যে একটা কিছু কিনারা করিতে পারিব, উপস্থিত গৃহ অপেক্ষা আফিস এবং গৃহিণী অপেক্ষা সাহেবের সঙ্গ প্রীতিপ্রদ মনে হইল।

আফিসে গিয়া দেখিলাম সৌভাগ্যক্রমে সাহেবের মেজাজটা আজ বেশ নরম। আমি অভিবাদন করিবামাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে একছড়া মুক্তার মালা দেখিতে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, বাবু, মালাটা পছন্দ সই নয় কি?" আমি অবশ্যই সুখ্যাতি করিলাম, তিনি আমার হাত হইতে মালা লইয়া কেসে পুরিয়া একটা পাশের ডেস্কে রাখিয়া দিলেন। আফিস বন্ধ হইবার সময় আর সে মালার কথা কিছুই বলিলেন না,—বোধ হইল যেন ভুলিয়া গেলেন, মালা ডেস্কের মধ্যেই রহিল—তিনি যথারীতি ডেস্ক বন্ধ করিয়া আমাকে চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন। আমার মনের মধ্যে একটা ভয় রহিয়া গেল এত টাকার জিনিসটা সাহেব এমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন। নানা ভাবনার মধ্যে ঐ এক ভাবনা জুটিল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া শুনিলাম গৃহিণী তাঁর সইয়ের কাছে টাকা ধার করিয়া একটা পার্শী সাড়ী ও একটা জ্যাকেট কিনিয়াছেন। গৃহিণী আমাকে দেখাইবার জন্য সাজিয়া গুজিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিলেন। আমি তাঁর মুখে হাসি দেখিয়া খুসী হইয়া যাহা বলিলাম তাহাতে তাঁহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল—তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "যাও।" এই সময় আমার সাহেবের সেই মুক্তার মালার কথা মনে পড়িয়া গেল—ভাবিলাম ইহার উপর যদি একগাছা মুক্তার মালা থাকিত তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইত, কিন্তু সে কথা গৃহিণীর কাছে প্রকাশ করিলাম না। প্রকাশ করিলাম

না বটে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি ও তার পরদিন সর্ব্বদাই একথা বার বার মনে আসিতে লাগিল, কিছুতেই ইহা তাড়াইতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম দোষ কি? এক রাত্রের মত আনিব বইত নয়—চুরীত করিতেছি না। আবার ভাবিলাম না—বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে পারিব না। মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করিলাম। ভাগ্যে গৃহিণীকে বলি নাই—তা' হলে তিনি হয়ত জেদ ধরিতেন—একথা কিছুতেই বলা হইবে না। মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। আসিবামাত্র সরোজ বলিলেন, "দেখ, সই বলছিল যে এ পোষাকে আমাকে বেশ দেখাচ্ছিল—এর উপর যদি গলায় একটা কিছু থাকৃত, তা' হলে রাজরাণীর মত দেখাত।" আমি একটু রসিকতা করিতে প্রয়াস পাইলাম—ফলে হইল কথায় কথায় সাহেবের মালার কথা বলিয়া ফেলিলাম। গৃহিণী অমনি বায়না ধরিলেন—সেটা এক রাত্রের জন্য আনিতেই হইবে—তার পরদিন সকালে সকালে গিয়া ডেস্কে রাখিয়া দিলেই চলিবে—আমি অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু সে সব কথা অশ্রুজলের বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল—আমাকে স্বীকার করিতে হইল।

তার পরদিন সন্ধ্যায় সরোজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন—আফিসে যাইবার সময় বিশেষ করিয়া মাথার দিব্যি দিয়া মালা আনিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—আমি বলিলাম "আরে রাম, এ কি ভুলিবার কথা।" কিন্তু কথাটা বলিতে বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। চারিটা বাজিতে না বাজিতেই সেদিন সাহেব চলিয়া গেলেন—তারপর আমি আরো ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করিলাম; এই একটা ঘণ্টায় আমি যে কষ্ট পাইয়াছিলাম—জীবনে এমন কখনও পাই নাই। বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে, হৃদয়ে সুমতি কুমতির প্রবল যুদ্ধ বাঁধিয়া

গেল। শেষে, যাহা হয় কুমতিরই জয় হইল—আমি কম্পিত হস্তে ডেক্স হইতে মালা বাহির করিলাম এবং খাপখানি যথাস্থানে ঠিক করিয়া রাখিয়া, মালাগাছটি সযত্নে ভিতরকার জামার পকেটে রাখিয়া ঘরে ফিরিলাম। পথে কতবার পিছনের দিকে চাহিতেছিলাম—কেবল মনে হইতেছিল—বুঝিবা সাহেব পুলিশ লইয়া আসিতেছেন। যাহা হউক শেষে বাড়ি পৌঁছিলাম। আসিয়া দেখি গৃহিণী সজ্জিত, রাস্তায় গাড়ী—কেবল আমার অপেক্ষা। আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ মালা।" আমি শুষ্ক কণ্ঠে বলিলাম "আনিতে পারিলাম না।" গৃহিণী আর কথাটি না কহিয়া আরক্ত মুখে দ্রুতপদে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। একবার মনে করিলাম গাড়ীতে গিয়া মালা দিয়া আসি, যখন চুরী করিয়াছি তখন আর ব্যবহার করিতে দোষ কি? শেষে স্থির করিলাম—যাক ঝড় ত কাটিয়াছে আর কেন? যদি কোন রকমে মালা নষ্ট হয় তা' হইলে কি হইবে। মালাগাছটিকে সযত্নে আমার হাতবাক্সে রাখিয়া চুপ করিয়া অন্ধকারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এভাবে বসিয়াছিলাম জানিনা—শেষে ভৃত্য মহাশয়ের ডাকে চমক ভাঙ্গিল, দেখিলাম তিনি দোকান হইতে খাবার আনিয়াছেন। আজ আমার এই ব্যবস্থা। আহারাদি করিয়া হুঁকাটি হাতে করিয়া বারান্দায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—যদি বাড়ী গিয়া হঠাৎ সাহেবের মালার কথা মনে পড়ে—যদি ফিরিয়া আফিসে আসিয়া মালার খোঁজ করেন—তারপর কাল কি হইবে? ভাবিতে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতার কথা ভাবিয়া নিজেই পুড়িতে লাগিলাম। হায়! সরোজ কেন এ জেদ করিল! স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী শাস্ত্রে লেখে। কিন্তু আমার এ পাপের যন্ত্রণার ভাগী এ সংসারে কেহই নাই।

অনেক রাত্রে গৃহিণী বাড়ী ফিরিলেন, আমাকে দেখিয়াও দেখিলেন না, আমি বুঝিলাম অভিমান হইয়াছে। আমি মান ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখি তিনি কাঁদিতেছেন, ক্রমে জানিতে পারিলাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া তিনি নিজের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিলাম। পরদিন দেখি সরোজের খুব জ্বর হইয়াছে। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম, আমার সংসারে ত আর কেহ নাই, সরোজকে কে দেখিবে ? এ দিকে অর্থাভাবে চিকিৎসা কি করিয়া চলিবে, ভাবিতে কষ্ট বোধ হইল। যাহা হউক হোটেলে আহার করিয়া আফিসে গেলাম ; আসিয়া দেখি জ্বর আরো বাড়িয়াছে, অবস্থা ভাল মনে হইল না, তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ; বলিলেন—খুব সাবধানে রাখিবেন ; নিমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত সেবা করিলাম। প্রাতে আবার ডাক্তার আসিলেন, অবস্থা আরো খারাপ হইয়াছে বলিলেন। আবার ঔষধ আনিলাম। ঠিকা যে ঝি ছিল তাহাকেই বলিয়া কহিয়া দিনের বেলায় থাকিতে বলিয়া আফিসে গেলাম। সাহেব আসিলে সব কথা বলিলাম, তিনি কথাটা তেমন করিয়া কাণে তুলিলেন না। এমনি করিয়া সাত দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে গৃহিণীর সাধের শাড়ী, জ্যাকেট বাঁধা পড়িয়াছে ; আমারও যাহা কিছু সবই বিক্রীত— আর চলে না, ডাক্তারের কয়েকটা ভিজিট বাকী, ঔষধালয়ে আর ধারে ঔষধ পাওয়া যাইতেছে না, ঝি চাকরের বেতন দিতে পারি নাই, তাহারা খুঁত খুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ দিকে শুশ্রূষার অভাবে সরোজের কষ্ট হইতেছে। আফিসে গিয়া সাহেবের নিকট এক

সপ্তাহের ছুটী ও অগ্রিম বেতনের জন্ম প্রার্থনা করিলাম—তাঁর লালমূর্ত্তি আরো লাল হইয়া উঠিল—তিনি যাহা বলিলেন তাহা ঠিক ভদ্র সমাজে প্রকাশ করিবার নহে—ভাবার্থ—যে এই দশ দিন আমি মন দিয়া কাজ করিতেছি না, এরূপ হইলে চাকরী থাকাই সন্দেহ, মাহিনা ত দূরের কথা। আর বেশী বলিতে সাহস করিলাম না—হায় গোলামী! সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিলাম, আসিয়াই আর কোন কথা না ভাবিয়া সেই মুক্তার মালা বাঁধা দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিলাম, সকলকে কিছু কিছু দিয়া শান্ত করিলাম।

একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া দেখি সরোজ বেশ সুস্থ হইয়া ঘুমাইতেছে—আমি ধীরে ধীরে তাহার শীর্ণ হাতটি তুলিয়া লইলাম এবং এক হাতে তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার স্পর্শে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সে আস্তে আস্তে আমার দিকে চাহিল। তার সে করুণ দৃষ্টিতে, আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিলাম—অনেকক্ষণ পরে সরোজ বলিল—'তোমায় বড় কষ্ট দিলাম—কি করে যে তুমি এত খরচ চালালে অসুখের মধ্যেও আমি সে সব কথা ভেবে একদিনও শান্তি পাইনি।' আমি একটু হাসিয়া বলিলাম 'তুমি সেরে ওঠ—আমার সব সার্থক হবে।'

তারপর—বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—জীবনের সব কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। বাল্যকালের সেই সব সুখের দিন মনে পড়িল—শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইয়া, পিসিমার স্নেহের মানুষ হইয়াছিলাম, তিনিও আমার বিবাহের পরেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন—তার পর বালিকা বধূ লইয়া সংসার ক্ষেত্রে নামিলাম—তারপর—কত সুখ, কত দুঃখ, কত অভাবের মধ্য দিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ

করিয়া আসিয়াছি, তার পর সাহেবের মালার কথা মনে পড়িয়া গেল, অভাবে পড়িয়া যাহা করিয়াছি, জগদীশ্বরের কাছে কি তাহার মার্জ্জনা নাই! তিনিই হয় ত আমার এ বিপদের সময় এই উপায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তা না হ'লে—আজো কেন সাহেব এ মালার কথা একবারও বলিলেন না, খোঁজও করিলেন না। যাই হোক মাহিনা হাতে অসিলেই ইহা উদ্ধার করিতে হইবে, এ কদিন ভালয় ভালয় কাটিলে হয়।

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, ভালয় ভালয় কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল—তারপর আপিসে মাহিনা পাইলাম, পাইয়াই মালা "খালাস" করিলাম। যাহা কিছু পাইয়াছিলাম—তাহা শুদে আসলে শেষ হইল বটে—কিন্তু মনটা একবারে হাল্কা হইয়া গেল—এতদিন যে কষ্টে কাটিয়াছিল তার তুলনায় রিক্ত হস্ত হওয়ার যে ভাবনা, তাহা অত্যন্ত সামান্ন মনে হইতে লাগিল। পরদিন মালা লইয়া সকালে সকালে আফিস গেলাম। তখনও সাহেব আসেন নাই—আমি যথা স্থানে মালা রাখিয়া দিলাম—সাহেব আসিলে একথা সে কথার পর কৌশলে মালার কথা তুলিয়া বলিলাম—"এত টাকার জিনিষটা আপনি এমন করে ফেলে রাখেন আমার বড় ভয় হয়—কোন দিন কে নেবে তার পর আমারই—" বলিতে বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল সাহেবের মুখে একটু হাসি দেখিলাম, আমার আরো ভয় হইল। সাহেব মুখ হইতে আস্তে আস্তে চুরুট নামাইয়া বলিলেন—"কি সেটা তুমি নাও নি—বাবু? ও মালাটা যে আমি তোমাকে দেবো বলে মনে করেছিলাম। তোমার স্ত্রীকে দিও মালা গাছটা। মনে করো না মালাটা তোমাকে দিয়ে, আমি খুব একটা বদান্যতা প্রকাশ করলাম—মুক্তাগুলো ঝুঁটো—আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু আবিষ্কার করেছেন।"

জাতিভেদ ও জাতীয়তা।

আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন জাতিকে কোন এক একতা-সূত্রে বাঁধিতে না পারিলে আর ভারতবাসীর কল্যাণ নাই। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবতঃ একটা প্রশ্ন উঠিতেছে—জাতিভেদ রক্ষা করিয়াও জাতীয়তা সম্ভব কি না? এই মহা প্রশ্নের দুই উত্তর পাওয়া যাইতেছে; এক পক্ষ বলিতেছেন, জাতিভেদ রক্ষা করিয়াও জাতীয়তা সম্ভব, অর্থাৎ এমন এক সূত্র আছে যাহা দ্বারা ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক ভেদ সত্ত্বেও ভারতের ভিন্ন জাতিকে এক করা যাইতে পারে। অপর পক্ষ বলিতেছেন, না সম্ভব নয়।

অন্যান্য দেশেও ত ধর্ম্ম ও সমাজ ভেদ রহিয়াছে; সেখানে যদি জাতীয়তা অর্থাৎ জাতীয় একতা সম্ভব হয়, তবে আমাদের দেশেই হইবে না কেন? এসিয়া খণ্ডের গৌরব স্বরূপ জাপানেও খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোকই আছেন; অথচ জাপানবাসিগণ কেমন একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে! জাপানে যাহা সম্ভব, ভারতে তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

অন্যান্য দেশের ধর্ম্মভেদ নিবন্ধন দেশবাসিগণ পরস্পরকে বর্জ্জন ও দমন করে না; জাপানবাসী বৌদ্ধগণ কখনই খ্রীষ্টানগণকে হীন, নীচ, অস্পৃশ্য ও মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চিত মনে করে না। জগতের কোন স্বাধীন দেশে ম্লেচ্ছ ও কাফের ব্রাহ্মণ ও শূদ্র প্রভৃতি বিদ্বেষ মূলক ভেদ নাই, তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে ভেদ সত্ত্বেও পরস্পরের মনুষ্যত্ব অস্বীকার করেন না; অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের, মানুষ বলিয়া যে কতকগুলি অধিকার আছে, তাহা তাঁহারা সকলকেই

দিতে প্রস্তুত, এবং এই অধিকার সাম্যই তাঁহাদের জাতীয়তার মূল। কিন্তু আমাদের দেশে কি তাহা আছে? ব্রাহ্মণ কি স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে শূদ্রের সহিত তাঁহার কোন বিষয়ে অধিকার সাম্য আছে? তিনি বলিবেন, শূদ্রের কেবল তাঁহার চরণ সেবার অধিকার; স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া নিজের জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করার অধিকার কি শূদ্রের আছে? অথচ এই স্বাধীনতাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক। কোন ব্যক্তি বা জাতিকে যদি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া মানব জীবন কি, মানব জীবনের লক্ষ্য কি, কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্ণয় করিতে না দিয়া, বলপূর্ব্বক, সামাজিক শাসনের দ্বারা তাহার উপর কোন একটা আদর্শ চাপাও, তাহা হইলে সেই চাপে তাহার মনুষ্যত্ব পিশিয়া যাইবে, তাহা দ্বারা আর কোন উন্নতির সম্ভব থাকিবে না। এই কৃত্রিম আদর্শের অনুসরণ করাতেই ভারতের প্রতিভা ও শক্তি কি ব্যক্তিগত ভাবে কি সমগ্র ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, সুতরাং এদেশ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পরাধীন হইয়া গিয়াছে। হায়! আমরা যদি বর্ণাশ্রমরূপ অস্বাভাবিক আদর্শ আনয়ন না করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় শক্তিকে ফুটিতে দিতাম, তাহা হইলে কি আর সহস্র বৎসর পর-পদদলিত হইতে হইত? আমরা আমাদের নিজেদের পায়েই কুড়াল মারিয়া, এখন বসিয়া হায় হায় করিতেছি!

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অধিকার সাম্য স্বীকার না করিলে জাতীয়তা সম্ভব নয় কেন? দেশের কল্যাণের জন্য পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে বাধা কি?

বাধা আছে। আমার যদি তোমার ন্যায় স্বাধীন ভাবে চিন্তা

ও কার্য্য করিবার অধিকারই না থাকে, তাহা হইলে আমি, তোমার ও আমার কল্যাণ যে এক, তাহা ত বুঝিতে পারিব না; সুতরাং তোমার ও আমার মিলনের ভূমিও থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ তুমি যদি আমার স্বাধীনতা স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে দেশের কল্যাণ যাহা, আমার পক্ষে তাহা কল্যাণ নহে। আমি মনে করিতেছি, মনুষ্যত্ব মানবের সাধারণ সম্পত্তি, এবং যাহাতে তাহার উন্নতি ও বিকাশ হয় তাহাই আমারও কল্যাণ, জাতিরও কল্যাণ। তুমি মনে করিতেছ তোমার ব্রাহ্মণত্বটি যাহাতে বজায় থাকে তাহাই তোমার কল্যাণ; সুতরাং তুমি আর আমার সঙ্গে ও সমস্ত ভারতবাসীর সহিত এক হইতে পারিতেছ কৈ? তোমার যাহা স্বার্থ তাহা আমার অনর্থ; তোমার ব্রাহ্মণত্ব আমার ব্যক্তিত্বের বিরোধী; অতএব তোমার সঙ্গে আমার জাতীয়তা সম্ভব নহে। তাহাই যদি হইল, তবে সকলে মিলিত হইয়া দেশের কল্যাণ করার অর্থ কি? মিলনের যখন ভূমি নাই, উদ্দেশ্য যখন এক নহে, তখন আর জাতীয়তা কি প্রকারে সম্ভব হয়?

কেহ হয় ত বলিবেন, মিলনের ভূমি নাই কেন? দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিই মিলনের ভূমি ও আমাদের জাতীয় একতার সূত্র। কোন হিন্দু যদি একটি কাপড়ের কল করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করেন, তাহাতে হিন্দুরও যেমন লাভ মুসলমানেরও তেমনি লাভ সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া দেশের কল্যাণ করিতে পারি।

কথাটা একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। দেশের ধন বৃদ্ধি হইলে যদি আমার নিজের সুখ বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সেই ধন বর্দ্ধন বিষয়ে আমার সহায়তা তুমি প্রত্যাশা করিতে পার না। হিন্দু ও

মুসলমানের ধন বৃদ্ধিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইলেও যত দিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রবল থাকিবে ততদিন হিন্দুর ধন বৃদ্ধিতে মুসলমানের কোন লাভ নাই, মুসলমানের ধনবৃদ্ধিতেও হিন্দুর কোন লাভ নাই বরং ধন বল বৃদ্ধি হওয়াতে পরস্পরের অধিকতর অনিষ্ট ও বিপদের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণ শূদ্রের ত কথাই নাই; ব্রাহ্মণের ধন বৃদ্ধিতে শূদ্রের অমঙ্গল; কারণ বল বৃদ্ধিবশতঃ তাহার প্রতি অধিক নির্য্যাতনের সম্ভাবনা; আবার শূদ্রের ধন বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব-লোপের আশঙ্কা। অতএব দেশের ধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বা মিলিত হইবে কেন? মূল স্বার্থে যখন ভয়ানক বিরোধ তখন আর মিলনের ভূমি কোথায়?

কেহ হয়ত বলিবেন, শিল্প বাণিজ্যে না হউক, রাজ নীতির ক্ষেত্রে ত আমরা এক হইতে পারি। জাতীয় মহাসমিতি ত এই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। প্রজাপুঞ্জ রাজার নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবে, ইহাতে ত সকলেরই স্বার্থ এক; তবে ইহাই আমাদের মিলনের ভূমি ও জাতীয়তার সূত্র।

আমাদের প্রকৃত রাজনীতি যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমানে "স্বরাজ" স্বায়ত্ত শাসনই আমাদের রাজনীতি। কিন্তু স্বরাজের মূলসূত্র কি? মূল সূত্র সাম্য অর্থাৎ এই ভারতবর্ষ আমাদের সকলের দেশ, ইহাতে আমাদের সকলেরই তুল্য অধিকার। ইহার মূলে স্বাধীনতারূপ সঞ্জীবনী মন্ত্রও আছে। ঈশ্বর আমাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং অন্য কাহারও আমাকে শাসন করিবার অধিকার নাই, আমি আমার জ্ঞানদ্বারাই চালিত হইব, আমার অন্তরস্থিত স্বর্গীয় আলোকই আমার পথপ্রদর্শক। এখন জিজ্ঞাসা করি,

যাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন, তাঁহারা মানব সাধারণের এই সাম্য ও স্বাধীনতা স্বীকার করিতে পারেন কি? পারেন না, কারণ ইহা স্বীকার করিলেই অসাম্য ও অধীনতা মূলক জাতিভেদ পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, জাতিভেদ সত্বে জাতীয়তার কোন সম্ভাবনাই নাই। সাম্যজ্ঞান হইলেই স্বভাবতঃ মৈত্রী আসিবে, এবং মৈত্রী আসিলেই স্বাধীনতা অব্যাহত হইবে। সুতরাং এক মহা-ভারতীয় জাতি গঠন করিতে হইলে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিতে হইবে। নান্য পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ।

বর্দ্ধমান জেলায় তরিকোণা নামক গ্রামে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার ঘোষের পিতার নাম জগবন্ধু ঘোষ। জগবন্ধু বাবু প্রচুর সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন না, কিন্তু সমাজে তাঁহার যথেষ্ট মান সম্ভ্রম ছিল। ডাক্তার ঘোষ বাঁকুড়ায় প্রথম শিক্ষলাভ করেন, বাল্যকালেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৬০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বলা বাহুল্য তাঁহার পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু সে সময় স্কুলে, পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার উপযুক্ত ছাত্র না থাকায়, এক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়।

১৮৬১ অব্দের প্রথমে রাসবিহারী বাঁকুড়া হইতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ

করেন; এল, এ পরীক্ষায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করেন; এইবার তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ইংরাজী ভাষায় অনর লইয়া প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি যত্নের সহিত বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেন; পাঠে তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছিল, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার সাহিত্য-রস-লিপ্সা পূর্ণ করেন। সেক্ষপীয়রের নাটক-গুলি তিনি এরূপ মনোযোগের সহিত বহুবার পাঠ করিয়াছিলেন যে, তাহা তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ; একবার তিনি যাহা শিখিতেন তাহা আর ভুলিতেন না; সেইজন্য অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রাসবিহারী বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অল্প দিনের মধ্যে রাসবিহারীর সাহিত্য ও আইনে পারদর্শিতার কথা শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হইল। রাসবিহারীর প্রতিভায় সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথমে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতি ব্যবসায়ে পসার প্রতিপত্তি করিবার জন্য তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এ বিষয়ে প্রাতঃস্মরণীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রাসবিহারী যখন হাইকোর্টে প্রবেশ করেন, তাহার অল্প দিন পরেই দ্বারকানাথ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন।

ওকালতি করিবার সময় রাসবিহারী বাবু আইন গুলি অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ব্যবসায় চালাইবার উপযুক্ত আইনজ্ঞান তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার স্থায় আইনজ্ঞ উকীল হাইকোর্টে একান্ত দুর্লভ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি আইনের অনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার চারি বৎসর পরে ডাক্তার ঘোষ ঠাকুর আইনের অধ্যাপক হন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ আইন সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার যুক্তি অব্যর্থ, তর্ক প্রণালী অনিন্দ্য সুন্দর। এদেশের আইন ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ডাক্তার ঘোষ অতি উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সমাজে রাসবিহারী বাবুর অসাধারণ সম্মান। ১৮৭৭ অব্দে তিনি বি, এল, পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন, ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৫ অব্দে তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করেন, ১৮৮৭ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য হন, এবং ১৮৮৯ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। তাহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সার রমেশচন্দ্র মিত্র বড়লাট সভার সদস্য পদ ত্যাগ করিলে তিনি সেই পদ লাভ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকালটির সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন।

স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায়, স্বদেশের সেবায়, ডাক্তার রাসবিহারীর কুণ্ঠা নাই। তিনি দেশের হিতানুষ্ঠানে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন; বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিবার জন্য কলিকাতা টাউনহলে যে সভা হইয়াছিল, ডাক্তার রাসবিহারী তাহার সভাপতির পদে বরিত হন।

সেই সভা উপলক্ষে দেশের লোক তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সভায় তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ সূচক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত চিন্তাশীলতা, পাণ্ডিত্য, লিপিকুশলতা ও যুক্তির সারবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৯০৬ অব্দে জাতীয় মহাসমিতির দ্বাবিংশতি অধিবেশনকালে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল। দেশের সহস্র সহস্র ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র কণ্ঠে তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাসবিহারী প্রাচীন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উৎসাহ উদ্যম ও কার্য্য শক্তি এখনও অটুট আছে। ডাক্তারের পিতা দীর্ঘজীবি ছিলেন, অশীতি বৎসর বয়সেও তিনি চারি পাঁচ মাইল ভ্রমণ করিতে পারিতেন; পিতার শক্তি পুত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে। ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করিবার সময় ডাক্তার রাসবিহারী ভবানীপুরে বাস করিতেন, তিনি শিয়ালদহের সান্নিধ্যেও কিছু দিন বাস করেন। এখন তিনি থিয়েটার রোডে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ডাক্তার রাসবিহারীর দেশ ভ্রমণে প্রবল অনুরাগ আছে, তিনি ভারতের বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ঐশ্বর্য্যবান ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াও সাহেব হন নাই; তিনি চোগা চাপকানের পক্ষপাতী।

ডাক্তার ঘোষ দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপত্য মুখ দর্শনে তিনি বঞ্চিত আছেন, তাঁহার কোন পত্নীই জীবিত নাই। আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাহার স্নেহানুরাগ যথেষ্ট, তাঁহাদের সুখসচ্ছন্দতা বিধানের জন্য তাঁহার চেষ্টার ক্রটী নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে এই গুণ আজকাল বড় বিরল হইয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মন্দিরে—কলিকাতায় বসু বলরামের বাটীতে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলায় বৈটকখানায় ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। সহাস্য বদন, ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরীশ, মাষ্টার, রাম বাবু, দ্বিজ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন।

আজ শনিবার। বেলা ৩টা হইবে। বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী ৯ই মে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

বলরাম বাড়ীতে নাই। তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকাতে, মুঙ্গেরে জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা (এখন স্বর্গগতা) ঠাকুর ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তুমি বল আমি কি উদার?'

ভবনাথ—(সহাস্যে) তিনি আর কি বলিবেন, চুপ ক'রে থাকবেন।

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাহিতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দুই একটি গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। থাক্ থাক্ আর কাজ নাই। পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই ত বল্‌লি!

একজন ভক্ত (সহাস্যে)—মহাশয় আপনাকে আমীর ঠাওরেছে। তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন—(সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—ব্যারাম হইয়াছে, ভাবতে পারে।

হাজরার অহঙ্কারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালিবাটী ত্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

নরেন্দ্র। হাজরা এখন মান্‌ছে তার অহঙ্কার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওকথা বিশ্বাস কোরো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্য ওরূপ কথা বল্‌ছে।

ভক্তদিগের প্রতি—নরেন্দ্র কেবল বলে হাজরা খুব লোক।

নরেন্দ্র। এখনও বলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন? এত সব শুনলি!

নরেন্দ্র। দোষ একটু;—কিন্তু গুণ অনেকটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিষ্ঠা আছে বটে।

সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না—কিন্তু পরে আমাকে তোমায় খুঁজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল। অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা ওখানে একরাত্রি দুই রাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি—খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও। একথার মানে এই যে, দুধ টুধ পাছে চায়, তাহলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বল্‌লুম—তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই; আর তুই সংসারে থেকে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে নানা কাণ্ড ক'রে এখন একটু জপ করে এত অহঙ্কার হয়েছে! লজ্জা করে না।

সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। রজ তমগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রংএর সঙ্গে উপমা দিয়াছে; রজগুণকে লাল রংএর সঙ্গে এবং তমগুণকে কাল রংএর সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বল্‌লে, 'নরেন্দ্রের ষোল আনা হয়েছে; আর আমার একটাকা দুই আনা।' আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, আমার কত হয়েছে? তা বল্‌লে, তোমার এখনও লালচে মারছে,—তোমার বার আনা (সকলের হাস্য)।

দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ কর্‌তো। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেষ্টা করিত। বাড়ীতে ক হাজার টাকার দেনা আছে—সেই দেনা শুধ্‌তে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ও সব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই?

(কামনা ও ঈশ্বর লাভ)

কি জান, একটু কামনা থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ—কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁস থাকিলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করিবে না।

ত্রিশ বছর মালা জপে, তবু কেন কিছু হয় না? ডাকুর ঘা হ'লে ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়। তা না হ'লে শুধু ঔষধে আরাম হয় না।

(সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ।)

কামনা থাকতে যত সাধনা কর না কেন সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে—ঈশ্বরের কৃপা হ'লে, ঈশ্বরের দয়া হ'লে একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার

ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হ'লে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

গরীবের ছেলে বড় মানুষের চোকে প'ড়ে গেছে। তার মেয়ের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিলে। অমনি গাড়ী, ঘোড়া, দাস, দাসী, পোষাক, আসবাব, বাড়ী সব হয়ে গেল।

একজন ভক্ত। মহাশয়, কৃপা কিরূপে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন কোনও ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে ব'সে আছে। কত লোক রাস্তা দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে রত্ন চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেবো না। আবার হয় ত যে চায়নি, চলে যাচ্ছে, তার পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে তাকে সেধে দিয়ে ফেলে।

[কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ; 'আমি' ও 'আমার'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

আমার কথা নেবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি;—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখ্‌লে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পার্‌বে। আবার দেখি সে আর এক রকম হ'য়ে যায়।

একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাত মৃত্যু হ'লে ভূত হয়। ঐ ভূতটা যেই দেখে কেউ শনি মঙ্গলবারে ঐ রকম ক'রে মর্‌ছে অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হ'ল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর দেখ্‌তে পাওয়া যে, সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে। হয় ও ছাত থেকে পড়ে অজ্ঞান হ'য়েছে আবার বেঁচে উঠেছে।

সেজবাবুর ভাব হ'ল। সর্ব্বদাই মাতালের মতন থাকে—কোনও

কাজ করিতে পারে না। তখন সবায় বলে এ রকম হ'লে বিষয় দেখ্‌বে কে? ছোট ভট্‌চার্জ্জি নিশ্চয় কোনও তুক ক'রেছে।

নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁস হ'য়ে গেল। তারপর চৈতন্য হ'লে কেঁদে বল্‌তে লাগ্‌ল, ওগো আমায় এমন কর্‌লে কেন? আমার যে বাবা আছে—আমার যে মা আছে গো—'আমার' 'আমার' করা এটী অজ্ঞান থেকে হয়।

গুরু শিষ্যকে বল্‌লেন, সংসার মিথ্যা, তুই আমার সঙ্গে চ'লে আয়। শিষ্য বল্‌লে, ঠাকুর, এরা আমায় এত সব ভালবাসে—আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন ক'রে যাব। গুরু বল্‌লেন. তুই 'আমার' 'আমার' কর্‌ছিস বটে আর বল্‌ছিস ওরা ভালবাসে; কিন্তু ওসব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটী করিস্‌, তাহ'লে বুঝ্‌বি সত্য ভালবাসে কি না। এই ব'লে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিলেন। এইটী খাস, তা হ'লে মড়ার মতন হ'য়ে যাবি। কিন্তু তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবি। তার পর আমি গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা হবে।

শিষ্যটি ঠিক ঐরূপ করলে। বাড়ীতে কান্নাকাটি প'ড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছড়া পিছড়ি ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বল্‌লে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বল্‌লে, এ ছেলেটী মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মড়া মানুষের হাত দেখে বল্‌লেন, সে কি, এ ত মরে নাই? আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি, খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ীর সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, তবে একটী কথা আছে। এই ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তার পর ওর খেতে হবে।

আর যিনি আগে যাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। তা, এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখ্‌ছি কেউ না কেউ অবশ্য যেতে পারে। মা কি স্ত্রী এঁরা খুব কাঁদছেন এঁরা অবশ্য যেতে পারেন, তখন তারা সব কান্না থামিয়ে চুপ ক'রে রহিল। মা বল্‌লেন, তাই ত এই বৃহৎ সংসার আমি গেলে, কে এসব দেখ্‌বে শুন্‌বে। এই বলে ভাবতে লাগ্‌লেন। স্ত্রী এই মাত্র কাঁদছিল—দিদিগো আমার কি হ'ল গো বলে। সে বল্‌লে, তাই ত ওঁর যা হবার হ'য়ে গেছে—আমার দুটী তিনটী নাবালক ছেলে মেয়ে—আমি যদি যাই এদের কে দেখ্‌বে।

শিষ্য সব দেখ্‌ছিল, শুনছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল আর বল্‌লে, গুরুদেব চল, তোমার সঙ্গে যাই। (সকলের হাস্য)।

আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হটযোগ ক'র্‌তো। গুরু তাকেও একটী ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে, যে হটযোগী ঘরে আসনে বসে আছে—এঁকে বেঁকে, খাড়ষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝ্‌তে পারলে তাঁর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, 'ওগো আমাদের কি হ'ল গো—ওগো তুমি আমাদের কি ক'রে গেলে গো—ওগো দিদিগো এমন হবে তা জানতাম না'। এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে। এখন একটী গোল হ'ল। এঁকে, বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে ও দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে গিয়ে একটী কাটারি নিয়ে দ্বারের চৌকাট কাটতে লাগ্‌লো, স্ত্রী অস্থির হ'য়ে কাঁদছিল, সে দুম দুম শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা ক'রলে, ওগো কি হয়েছে গো। তারা বল্‌লে ইনি বেরুচ্ছেন না,

তাই চৌকাঠ কাট্‌ছি। তখন স্ত্রী বলিল, ওগো অমন কর্ম্ম ক'রো না, গো—আমি এখন রাঁড় বেওয়া হ'লুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই ; কটী নাবালক ছেলেকে মানুষ ক'রতে হবে। এ দোয়ার গেলে আর ত হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে—ওঁর হাত পা কেটে দাও। তখন হটযোগী দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। তার তখন ওষুধের ঝোঁক চ'লে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, তবে রে শালী, আমার হাত পা কাটবে। এই বলে বাড়ী ত্যাগ ক'রে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। (সকলের হাস্য)।

অনেকে ঢং ক'রে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে, আর আর গহনা সব খোলে ; খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তার পর আচড়ে এসে পড়ে আর কাঁদে, 'ওগো, দিদিগো, আমার কি হ'লো গো'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তের, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে অবতার সম্বন্ধে বিচার।

নরেন্দ্র। proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন।

গিরীশ। বিশ্বাসই Sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিষটী এখানে আছে, এর প্রমাণ কি ? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত। External World (বহির্জগত) বাহিরে আছে Philosophy বা (দার্শনিক বা) কেউ prove করতে পেরেছে ? তবে বলেছে irresistible belief (বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস

হ'বে না। হয়ত বল্‌বে ও বল্‌ছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

নরেন্দ্র। তার প্রমাণ কই।

গিরিশ। তোমার সাম্‌নে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।

নরেন্দ্র। অমর, Past ages তে ছিল প্রুফ চাই।

মণি পল্টুকে কি বলিয়া দিলেন।

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)। অনাদি কি দরকার? অমর হ'তে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটীর ছেলে (সকলের হাস্য)।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরীশাদি ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে)। নরেন্দ্রের কথা ইনি আর নেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে)। আমি একদিন বল্‌ছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বল্‌লে এ জলও চাতক খায়। তখন মাকে বল্লুম, মা, এসব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল। ভারি ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে বলে উঠ্‌ল, ঐ ঐ। আমি বল্লাম, কি? ও বল্লে ঐ চাতক, ঐ চাতক। দেখি, কতক গুলো চামচিকে। সেই দিন থেকে ওর কথা আর লই না।

(ঈশ্বর-রূপ দর্শন কি মনের ভুল?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদুমল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বল্‌লে, তুমি ঈশ্বরের রূপটুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক হয়ে, ওকে বল্লাম,

কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র বল্লে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। ব'ল্লাম একি হ'লো। এসব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বল্‌লে। তখন দেখিয়ে দিলে—চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ! আর বল্‌লে, এসব কথা মেলে কেমন ক'রে যদি মিথ্যা হবে। তখন বলেছিলাম, শালা, তুই আমার অবিশ্বাস ক'রে দিস্‌নি! তুই আর আসিস নি।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শাস্ত্র ও ঈশ্বরের বাণী revelation]

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২শ বৎসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র। (গিরীশ, মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি)। শাস্ত্রেই বা বিশ্বাস কেমন ক'রে করি। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র একবার বল্‌ছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে। আবার বলে, পার্ব্বতী উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই।

মনুসংহিতায় মনু লিখ্‌ছেন, মনুরই কথা। Moses লিখ্‌ছেন Pentateuch, তারই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা।

সাংখ্যদর্শন বল্‌ছেন, 'ঈশ্বরা সিদ্ধেঃ'। ঈশ্বর আছেন এ প্রমাণ করবার যো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য।

তা বলে, এ সব নেই, বল্‌ছি না। বুঝ্‌তে পারছি না, বুঝিয়ে দাও।

শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই ক'রেছে। এখন কোনটা লেব? White light (আলো) Red medium র (লাল কাঁচের) মধ্য দিয়া এলে লাল দেখায়। Green medium র মধ্য দিয়া এলে Green দেখায়।

একজন ভক্ত। গীতা ভগবান বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে।

একজন ভক্ত। গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন।

নরেন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না হয়ে বলেছেন!—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সব বেশ কথা।

শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থ টুকু নিতে হয়; যে অর্থ টুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্চে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিল্‌লে কিছুই নেই না।

আবার অবতারের কথা পড়িল।

নরেন্দ্র। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলেই হ'ল। তার পর তিনি কোথায় ঝুলচেন বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অবতার।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাতযোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিলেন 'আহা!'।

মণি ভবনাথকে কি বলিলেন।

ভবনাথ। ইনি কি বলেন, 'হাতী যখন দেখি নাই, তখন সে ছুঁচের ভিতর যেতে পারে কি না কেমন করে জানিব? ঈশ্বরকে জানি না, অথচ তিনি মানুষ হ'য়ে অবতার হতে পারেন, কি না, কেমন ক'রে বুঝব'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই সম্ভব। তিনি ভেলকি লাগিয়ে দেন। বাজী-

কর গলার ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বের করে। ইট পাটকেল খেয়ে ফেলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম্মযোগ)।

একজন ভক্ত। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম্ম করা কর্ত্ত'ব্য। এ কর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে হবে না।

গিরীশ। সুলভ সমাচারে ঐরকম লিখেছে, দেখ্‌লাম। কিন্তু ঈশ্বরকে জানবার জন্য যে সব কর্ম্ম তাই ক'রে উঠতে পারা যায় না, আবার অন্য কর্ম্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈষৎ হাসিয়া মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, ও যা বল্‌ছে তাই ঠিক।

মাষ্টার বুঝিলেন, কর্ম্মকাণ্ড বড় কঠিন।

পূর্ণ আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (পূর্ণের প্রতি)—কে তোমাকে খবর দিলে ?

পূর্ণ। শারদা

শ্রীরামকৃষ্ণ (উপস্থিত মেয়ে ভক্তদের প্রতি)। ওগো, একে (পূর্ণকে) একটু জলখাবার দাও ত।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা শুনিবেন।

নরেন্দ্র গাইতেছেন।

গান।

পরবত * * * *

গান।

সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে ॥

* * *

গান।

বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন
তাঁরে কেন ডাকনা ॥
মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ একি ঘোরে মরি একি বিড়ম্বনা।

* * * *

পল্টু। (নরেন্দ্রের প্রতি)। এই গানটী গাইবেন।

নরেন্দ্র। কোনটী ?

পল্টু। দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে
কি ভয় সংসার দুঃখ ঘোর বিপদ শাসনে।

নরেন্দ্র। এই গানটী গাইলেন।

মাষ্টারের অনুরোধে আবার গাইতেছেন। মাষ্টার ও ভক্তেরা অনেকে হাতজোড় করিয়া গান শুনিতেছেন।

গান।

হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে
লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদরে।

* * *
* * *
* * *

গান।

চিন্ময় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।

* * * *

গান।

চমৎকার অপার জগত রচনা তোমার।

* * * *

গান।

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জলে।

* * * *

গান।

সেই এক পুরাতনে পুরুষ নিরঞ্জনে
চিত্ত সমাধান কর রে।

* * * *

রামা'দের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাইতেছেন।

এস মা এস মা, ও হৃদয় রমা পরাণ পুতলী গো।
হৃদয় আসনে হও মা আসীন নিরখি তোরে গো॥

* * * *

(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে।)

নরেন্দ্র নিজের মনে গাইতেছেন।

গান।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশী।
তাই যোগী ধ্যানধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী॥

* * *

* * *

সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।
নরেন্দ্র আর একবার সেই গানটী গাইতেছেন।

গান।

হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।

*   *   *

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। ঠাকুর উত্তরাস্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া তাকিয়ার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট।

ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর মার সঙ্গে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—"এই বেলা খেয়ে যাব।

"তুই এলি? (অর্থাৎ মা কি এলি?) তুই কি গাঁটুরি বেঁধে বাসা পাকড়ে সব ঠিক ক'রে এলি।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।]

"এখন আমার কারুকে ভাল লাগে না।

"মা, গান কেন শুনব? ওতে ত মন খানিকটা বাইরে চ'লে যাবে। ঠাকুর ক্রমে ক্রমে আরও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—

"আগে কইমাছ জাইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য্য হ'তুম; মনে ক'রতুম এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা ক'রবে। তার পর অবস্থা যখন খারাপ হতে লাগল তখন দেখি, যে শরীর গুল খোল মাত্র। থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।

ভবনাথ। তবে মানুষ হিংসা করা যায়—মানুষকে মেরে ফেলা যায়?*

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, এ অবস্থায় হতে পারে।

---

* ন হন্যমানে শরীরে (গীতা, ২য় পরিচ্ছেদ বিংশতি শ্লোক।)

দুই এক পাপ নেমে এলে তবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে।

ঈশ্বরেতে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে। এই বিদ্যা মায়া ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়. অবিদ্যা মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাৎ করে নিয়ে যায়। বিদ্যার খেলা. জ্ঞান, ভক্তি. দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় ক'রলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায়।

"আর এক ধাপ উঠ্‌লেই ঈশ্বর—ব্রহ্মজ্ঞান।

"এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্চে—ঠিক দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন। ত্যজ্য গ্রাহ্য থাকে না। কারু উপর রাগকরবার যো থাকে না।

"গাড়ী করে যাচ্চি—বারাণ্ডার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী,—দেখে প্রণাম করলাম।

"যখন এই অবস্থা প্রথম হোলো, তখন মা কালীকে পূজা ক'রতে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না। হলধারী আর হৃদে বল্‌লে, খাজাঞ্চী বলেছে, ভটচাজ্জি ভোগ দেবেন না তো কি—করবেন? আমি কুবাক্য বলেছে শুনে, কেবল হাসিতে লাগলাম,—একটুও রাগ হোলো না।

"এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তার পর লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু একটী সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্চে। এমন সময়ে তার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হোলো। সে বললে, 'তুমি যে ঘুরে ঘুরে আমোদ করে বেড়াচ্চো তল্পী তাল্পা কই? সে গুলিতো চুরী করে নিয়ে যায় নাই? প্রথম সাধু বল্‌লে, না মহারাজ আগে বাসা পাকড়্ গাঁটরী পঠরী ঠিক্‌ঠাক করে ঘরে রেখে তালা লাগিয়ে, তবে রংদেখে বেড়াচ্চি। (সকলের হাস্য)।

ভবনাথ। এ খুব উচু কথা।

মণি (স্বগতঃ)। ব্রহ্মজ্ঞানের পর লীলা-আস্বাদন! সমাধির পর নীচে নামা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারাদির প্রতি)। ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি। ন্যাঙটা বোলতো, 'আরে মন বিলাতে নাহি'।

(Biology in the Spiritual world)*

"এ অবস্থায় কেবল হরি কথা ভাল লাগে—আর ভক্ত সঙ্গ (রামের প্রতি) তুমি তো ডাক্তার;—যখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে যাবে তখনই তো কাজ হবে। তেমনি এ অবস্থায় অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর। সে দেখবে তিনিই দেহ মন প্রাণ আত্মা!

মাষ্টার (স্বগতঃ)। Assimilation!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ হলেই 'অহং' নাশ;—যেটা 'আমি' 'আমি' করছে। এটী ভক্তিপথেও হয়; আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয়। 'নেতি' 'নেতি',—অর্থাৎ এসব মায়া স্বপ্নবৎ এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ 'নেতি'—মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব—'আমি' ঘট মধ্যে রয়েছে।

'মনেকর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে; তার মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। কটা সূর্য্য দেখা যাচ্ছে?

একজন ভক্ত। দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য্য তো আছে।

* 'Natural Law in the Spiritual world'—by Dr. Drummond.

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে কর, একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে; এখন কটা সূর্য্য দেখা যায়?

একজন ভক্ত। নয়টা। আর একটা সত্যসূর্য্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া গেল; কটা সূর্য্য দেখা যাবে?

একজন ভক্ত। একটা প্রতিবিম্ব সূর্য্য। একটা সত্য সূর্য্য ত আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)। শেষঘট ভাঙ্গলে কি থাকে?

গিরিশ। আজ্ঞা, ঐ সত্য সূর্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তা মুখে বলাই যায় না। যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সূর্য্য না থাকলে সত্য সূর্য্য আছে কি করে জানবে। অহং তত্ত্ব সমাধিস্থ হলে নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরভক্তদিগের প্রতি আশ্বাস প্রদান ও অঙ্গীকার।]

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বলরামের বৈটকখানায় দীপালোক জ্বলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ; ভক্তজন পরিবৃত হইয়া আছেন। ভাবে বলিতেছেন—

"এখানে আর কেউ নাই; তাই বলছি,—'আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জান্‌তে চাইবে তারই হবে; হবেই হবে। যে ব্যাকুল; ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না; তারই হবে।

এখানকার লোকেরা (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) সব ফুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলেদেবে, 'এই কোরো, এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাকো'।

[ঈশ্বরই গুরু, জীবের মুক্তির উপায়।]

"কেন ঈশ্বরের দিকে (জীবের) মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশী। (সকলের হাস্য)।

"নারদকে রাম বল্লেন, নারদ আমি তোমার স্তবে বড় প্রসন্ন হয়েছি; আমার কাছে কিছু বর লও। নারদ বল্‌লেন, রাম তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শ্রদ্ধা ভক্তি হয়; আর এই কোরো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বল্‌লেন, তথাস্তু; আর কিছু বর লও। নারদ বল্‌লেন, রাম আর কিছু বর চাই না।

"এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মুগ্ধ। ঈশ্বর দেহ ধারণ করেছেন—তিনিও মুগ্ধ হন। রাম সীতার জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"।

"তবে একটী কথা আছে;—ঈশ্বর মনে করলেই মুক্ত হন।

ভবনাথ। Guard (রেলের গাড়ীর গার্ড) নিজে ইচ্ছা করে রেলের গাড়ীর ভিতর আপনাকে রুদ্ধ করে; আবার মনে করিলেই নেমে পড়্‌তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর কোটী--যেমন অবতারাদি—মনে কর্‌লেই মুক্ত হতে পারে। যারা জীবকোটী তারা পারে না। জীবরা কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ। ঘরের দ্বার জানলা ইস্‌কুরু (Screw) দিয়ে আঁটা। বেরুবে কেমন করে?

ভবনাথ (সহাস্যে)। যেমন রেলের 3rd Class passenger রা (আরোহীরা) চাবীবন্ধ—বেরুবার যো নাই।

গিরীশ। জীব যদি এরূপ আষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ, তার এখন উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে গুরুরূপ হয়ে ঈশ্বর স্বয়ং যদি মায়াপাশ ছেদন করেন, তাহলে আর ভয় নাই।

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে তিনি নিজে জীবের মায়াপাশ ছেদন করতে, দেহ ধারণ করে, গুরুরূপ হয়ে এসেছেন?

চাক্‌মাজাতির উপজীব্য।

[চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরার চাক্‌মা নামক জাতি বিশেষের বাস; ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধলক্ষ হইবে। শারীরিক গঠনপ্রণালী অনেকটা মঘ, ত্রিপুরাদি পার্ব্বত্য অপরাপর জাতির অনুরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহারাও "লোহিত" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যারকিও-সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ইহাদিগের দুইটী মাত্র প্রাচীন নিদর্শন—"ধনপতি রাধা মোহনের উপাখ্যান" এবং চাটিগাঁ ছড়া" আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলেও প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং

ইহারাও "লোহিত্তিক বা "তিব্বতী ব্রহ্মা" শ্রেণীর অন্তর্গত।* কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা বৌদ্ধ দলভুক্ত হইয়াছে। †]

(কৃষি।)

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।" এক কথায় কৃষি মানবের জীবন স্বরূপ। সংসারে যে সমুদয় স্বার্থ-কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য মনুষ্যরক্তে লোলুপ হয়, কৃষিতে তাহারও নিবৃত্তি ঘটে। কৃষক অপরিসীম শ্রমসহকারে পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি করে; এতভিন্ন যে ধনের হস্তান্তরিত করণ—তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপার্জ্জন। হায়, যে ভারতে মিথিলাধীশ্বর জনক স্বহস্তে লাঙ্গল চালনা করিতেন, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া অভিমান-দৃপ্ত আমরা ঈদৃশ লোকহিতকর কৃষিকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করি। সত্য বটে, অধুনা ভারতের চারিদিকে কৃষিশিল্প লইয়া আলোচনা চলিতেছে, স্থানে স্থানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এই বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় সে আন্দোলন অতি সামান্য মাত্র। ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসূ, ভূভাগ প্রায় বিনা যত্নেই অনন্ত রত্নরাশি প্রদান করিতেছে। যদি আমরা কৃষির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হই, তাহা হইলে রপ্তানী রাক্ষসী শত জিহ্বা বিস্তারেও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, বরং তাহাতে রত্নগর্ভা ভারতের ঐশ্বর্য্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

সমাজের আসক্তি।

লিখিতেও সুখানুভব করিতেছি যে, কৃষিকর্ম্মের প্রতি চাক্‌মা-

---

* ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং প্রাচীন কাহিনী লইয়া 'আষাঢ়' এবং 'মাঘ' (১৩১৩) সংখ্যায় "ভারতী"তে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

† এতৎ সম্বন্ধেও "বৌদ্ধবন্ধু"র বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক" সংখ্যায় (১৩১৩") বিস্তৃত বিবরণী বাহির হইয়াছে।

দিগের কোনও অবজ্ঞার ভাব নাই, ইহাতে বংশ ও শিক্ষাভিমান নির্ব্বিশেষে প্রায় সকলেরই আসক্তি দেখা যায়। সাধারণতঃ হেড্-ম্যানগণ (ক) নিজেরা সমস্ত কাজ করেন না বটে, কিন্তু যতদূর সাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন না। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও অবকাশ পাইলে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে কৃষিকর্ম্মে যোগদান করিয়া থাকে এবং পাঠ সমাপ্তির পর যতদিন না অভিলষিত কর্ম্ম গ্রহণ ঘটে, অর্থাৎ যখন আমরা তাস পাশার কি উৎসব-আমোদে অথবা "ভারত উদ্ধার" ব্যপদেশে উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত থাকি, সেই সময়টুকুও চাক্‌মা যুবকগণ আপনাপন কৃষিকর্ম্মে তৎপর রহে। বর্ত্তমানে যে আমাদের বিদ্যালয় সমূহে কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষাদানের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ মঙ্গলদায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে এক দিকে যেমন কৃষিকার্য্যের প্রতি ঘৃণার ভাব বিদূরিত হইবে, পক্ষান্তরে তেমনি জীবিকা সংস্থানের নিমিত্ত শেতাঙ্গ নিগ্রহভোগের পরিবর্ত্তে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত রহিবে! বিলাসিতার খরস্রোতে যখন নব্য চাকমা যুবকদিগের কৃষিশ্রদ্ধা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, ঠিক উপযুক্ত সময়ে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী-পবনসঞ্চালনে ভবিষ্যতের আশায় আশ্বাস প্রদান করিতেছে।

বস্তুতঃ (চট্টগ্রামের) এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কৃষি-উপযোগী বিস্তর ভূমি পড়িয়া আছে; সামান্য চেষ্টা করিলেই আবাদ করা যাইতে পারে। উর্ব্বরাশক্তিও প্রখর, তাহাতে আবার বহুকাল যাবত অনাবাদে পতিত থাকায় যথেষ্ট বল সঞ্চিত রহিয়াছে। এ হেন ক্ষেত্রে একটু মনোযোগের সহিত কৃষির নিমিত্ত খাটিলেই উন্নতি

(ক) ইহাদের মধ্যে এক, দুই বা ততোধিক গ্রাম লইয়া গঠিত মৌজার উপর এক এক জন মোড়ল থাকেন। তাঁহাদের পদবী—হেড্ম্যান (head man)।

নিঃসন্দেহ। অভাবের তাড়নায় এবং কর্ম্মক্ষেত্রের ভীষণ প্রতিযোগিতায় ইহারা ক্রমেই কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে। এতৎপ্রতি প্রজাসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে, বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়বাহাদুর "রাজবিলাস" নামক স্থানে সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে "মডেল ফারম" (model farm) খুলিয়াছেন, এবং কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়বাহাদুরও তাঁহার 'বন্দুকভাঙা' মৌজায় অপর এক "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" খুলিতেছেন। তাঁহাদের সাধুচেষ্টা সফল হউক, ইহাই কামনা।

জুম।

ইহাদিগের কৃষিকর্ম্ম দ্বিবিধ প্রথায় নির্ব্বাহিত হয়। প্রথমতঃ জুম এবং দ্বিতীয় হল। পার্ব্বত্য প্রদেশ মাত্রেই অর্থাৎ যে সকল ভূমিতে লাঙ্গল চালাইবার সুবিধা নাই, জুমের প্রচলন আছে। সমগ্রভারতের সমুদয় পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথায় কৃষি চলিয়া থাকে। হিমালয় হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা যায়। ইহা ব্রহ্ম ও আরাকানে "টংগ্যা" এবং মধ্যপ্রদেশে "খৈরা" নামে প্রসিদ্ধ। 'জুম' কথাটী সম্ভবতঃ 'জঙ্গম' শব্দ হইতে উৎপন্ন, কেন না ইহাও গমনশীল। যেখানে এক বৎসর জুম করা হয়, ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সে ক্ষেত্রে পুনরাবার চলে না। সুতরাং অনায়াস লভ্য বিস্তীর্ণ ভূমি থাকিলে এই প্রথা মন্দ নহে। ইহাতে পরিশ্রম কিঞ্চিৎ অধিক প্রয়োজন বটে, কিন্তু সামান্য মূলধনেই চলিতে পারে। এই কারণে অত্রত্য অধিকাংশ সাধারণ পরিবারে ইহাই একমাত্র উপজীব্য। বিগত সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, চাক্‌মাদিগের ১৪৭৭২ পুরুষ ও ১২৭৮৯ স্ত্রীলোক কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তন্মধ্যে ১৪০২৩ পুরুষ এবং ১২০৬০ স্ত্রীলোক জুম করিয়া থাকে।

কর্ত্তন ও দাহন।

পৌষ মাঘ হইতেই ইহারা জুমোপযোগী নিবিড় বনভূমি অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরন্তু জুমক্ষেত্র যথাসাধ্য একে অপরের অনতি দূরে নির্ব্বাচন করিবার চেষ্টা করে; তাহাতে বীজবপন, ঘাসোৎপাটন, ফসল সংগ্রহ প্রভৃতিতে জুমিয়াগণ পরস্পর পরস্পরের সাহায্য পায়। ফাল্গুনের প্রারম্ভে—যখন মলয়কর-সঞ্চালনে তরুলতা নবীন-ললিত সুষমা ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক আকুল করিয়া তোলে, এবং বসন্তের এ হেন সজ্জায়—কোকিলের অশ্রান্ত অনুরাগে পরসুখ-কাতরা বিরহিণীগণ অন্তরে অন্তরে তুষানলে জ্ব'লতে থাকে, তাহাদিগের সহানুভূতিতেই যেন, সেই সুখ-দুঃখের সম্মিলন কালে 'জুমিয়াগণ বিরহিণীকুলবৈরী বৃক্ষবল্লরীর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিরাটকায় অথচ ফসলের কোন অনিষ্ট ঘটাইবার আশঙ্কা নাই, তাদৃশ বৃক্ষগুলি মাত্র বাঁচিয়া থাকিতে পায়। কিন্তু ইহাতেই যে হতভাগ্যগণ যন্ত্রণাদায় হইতে রক্ষা পাইল তাহা নহে, অনন্তর যখন চৈত্রশেষে হুতাশনের লোলজিহ্বায় 'খাণ্ডব দাহন' অভিনীত হয়, তখন মনে হয়, এরূপ মরমে জ্বলিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহাদের সেই সময়েহ জুমিয়াগণের করাল "তাগল" (দা বিশেষ) আঘাতে নিহত হওয়া ছিল ভাল। কর্ত্তন পর্ব্বের পর হইতে ইহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণও প্রাণান্তপণে স্বামীর সহায়তায় তৎপরা হয়। পাঠক, ইহাদের সেই কর্ম্মজীবন বর্ণনার অতীত! চৈত্রের খরতর মার্ত্তণ্ডময়ুখমালা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; মনে হয় যেন —স্মরহর এবার কালাগ্নি সদৃশ কোপাগ্নিতে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীকরণে উদ্যত হইয়াছেন, সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া জুমিয়া দম্পতি অনাবৃত মস্তকে অবিচলিত উৎসাহে স্বকার্য্য সাধনে নিরত রহিয়াছে! দূর দর

ধারায় ঘর্ম্ম প্রবাহিত হয়, ধমনীনিচয়ের ঘন ঘন সঞ্চালনে গৌরাঙ্গ আরক্তিম হইয়া উঠে, এই অবকাশে একবার পরস্পরের দৃষ্টিতে আসিলে যাবতীয় ক্লান্তি অবসান পায়, বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়! সুরসিক যাহারা সেই নির্জ্জন প্রদেশে উদ্‌ভ্রান্ত রাগিণীর লহরী তুলিয়া অপূর্ব্ব প্রণয় সঙ্গীতে আকুল পিয়াসা চরিতার্থ করে; এবং গানের উপসংহার সূচক "কুই" ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রাণের উৎফুল্লভাব পরিস্ফুরিত হয়। এতদতিরিক্ত উপহাস বিদ্রূপ এবং ঠাট্টা কৌতুক ইত্যাদি ইত্যাদি কতই আছে! দম্পতির এমন সম্মিলিত শ্রম কত যে বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ, তাহা কল্পনায় আসিবে না— কার্য্যে অনুভব করিবার সামগ্রী!!

আনুনী-ছুতা।

বস্তুতঃ জুমে অগ্নি সংযোগ এক ভীষণ ব্যাপার! সে সময়ে সবিশেষ সাবধান না থাকিলে বিষম অনিষ্ট, এমন কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। আগুন লাগিলে চৌদিগ্‌বদ্ধ গিরিগুহায় বায়ুদেব দিশাহারা হইয়া যান, তাই রোষে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া আততায়ীর প্রাণবিনাশে চেষ্টা করেন। এইরূপে সমুদয় বনস্থলীতে ঘোর দাবদাহ উপস্থিত হয়, কোন কোন সময় সেই উদ্দাম হুতাশন-জিহ্বা লোকবসতিও আক্রমণ করিয়া অসীম ক্ষতি সংঘটিত করে। আগুন দিবার পূর্ব্বে পরিশুষ্ক বৃক্ষবল্লরী এমনি সুকৌশলে সাজাইতে হয়, যেন সর্ব্বাংশে সমভাবে জ্বলিতে পারে; এবং অকর্ত্তিত জঙ্গলের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। সচরাচর বাতাসের নিশ্চল সুযোগেই অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং তখন জুমিয়া দম্পতি সপল্লব শাখা হস্তে অনলদেবের সীমা রক্ষা করে। যদি সর্ব্বভুকের অব্যাহত প্রভাবে নিতান্ত বৃহত্তর কাষ্ঠগুলি ব্যতীত আর সমুদয় ভস্মসাৎ হইয়া একাধিক

ইঞ্চি পরিমিত ভূপৃষ্ঠভাগ পর্যান্ত পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা জুমের শুভ লক্ষণ মনে করিয়া থাকে। অনন্তর দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠগুলিকে ক্ষেত্রপার্শ্বে সরাইয়া ফেলে। ইহারই সাধারণ আখ্যা—"আনুনী-ছুত্তা" আমাদের কথায়—প্রথম বাছন।

বপন।

এক্ষণে বপনের কার্য্য। বরুণদেব পবিত্র স্নেহধারায় ধরিত্রীকে শীতল করিলে জুমিয়া পরিবারের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই কটিদেশে ধান্য, তিল, ভুট্টা, লাউ, কুমুড়, শশা, আলু, কচু, মার্ফা, বেগুণ, চিনার, কার্পাস, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ শস্যের বীজপূর্ণ "কুরুং" (১) লইয়া "চুচ্যাংতাগল" (২) হস্তে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। "তাগল" দ্বারা দক্ষিণ হস্তে সমদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া বামহস্তে তন্মধ্যে কতেক মিশ্রিত বীজ রোপণ করে। এই সকল গর্ত্ত তিন ইঞ্চির অধিক গভীর করা হয় না। বীজ বপনের পর সামান্য মৃত্তিকা উপরিভাগে চাপা দেওয়া হয়।

"বীজপোতনা", "কোমকছুত্তা" ও "মিরছুত্তা"।

অনন্তর বৃষ্টি পড়িলে যখন যাবতীয় শস্যের চারা উঠিয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মধ্যে যে সকল আগাছা জন্মে, তৎসমুদয় অন্ততঃ তিনবার পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। প্রথমবার জ্যৈষ্ঠমাসে যে বাছন হয়, তাহার নাম—"বীজপোতনা"। দ্বিতীয় বার আষাঢ় মাসে এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষবাছন প্রায়শঃ শ্রাবণ মাসেই হইয়া

(১) "কুরুং"—বাঁশের চ্যাটারী নির্ম্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

(২) "চুচ্যাংতাগল"—সুঁচালো দা বিশেষ।

এই সকলের বিস্তৃত পরিচয় জানিতে ইহলে "কল্পতরু" অগ্রহায়ণ (১৩১৩) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

থাকে। এই দুই ছুতাকে ইহারা যথাক্রমে "ছুতীকুচ্যা বা কোমরছুতা" এবং "মিরছুতা" আখ্যায় অভিহিত করে। এতদ্ব্যতীত জুম ক্ষেত্র নিংড়ানের আবশ্যক হয় না। তবে বৃষ্টি অধিক হইলে জুমকৃষিতে তরি-তরকারীর গাছগুলি প্রায় নষ্ট হয়, কার্পাসেরও সমূহ অপকার ঘটিয়া থাকে।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন ফসল বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে, সে সময়ে তাহারা "জুমপূজায়" ব্রতী হয়। ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনও বনস্পতি-ছায়ায় বাঁশের একটি কার্পাস বৃক্ষাকৃতি প্রতিষ্ঠিত করে। অনন্তর তন্মূলদেশে ইহাদের জাতীয় প্রত্যেক দেবতারই উদ্দেশে এক একখানি "মারেই" (৩) দুই-দুইখানি পাতায় গাঁথিয়া প্রোথিত করিয়া থাকে। প্রথমে "বৃহত্তারা" (৪) দেবের পূজার নিয়ম, তৎপরে গঙ্গাপূজা। শেষোক্ত পূজায় নদীকূলে দুইটি ছাগল বলি দিতে হয়। পরে "গইরা" প্রভৃতি অপদেবতাকে পূজা করিয়া একটী শূকর, ১৬টী মোরগ, এবং যথাসাধ্য সংখ্যায় হাঁস, পারাবত ইত্যাদি বলি দেয়। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণের আড়ম্বরও কম নহে। এবং পূজায় মদ্যই প্রধানতম উপচার; ঐ সঙ্গে একখানি "তাগল"ও দেওয়া হয়। অতঃপর ধান পাকিলে "মা-লক্ষ্মী-মার" পূজা করিবার বিধি। ইহাতে পূজাপদ্ধতি কিছুই নাই, কেবল ওঝা (৫) ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া একটী শূকর

(৩) "মারেই"—বাঁশের একখানি সামান্য 'বাখারী'র একদিকে চাঁচিয়া মাথায় ঝুট করা হয়।

(৪) "বৃহত্তারা"—সৃষ্টির পরে ইনি লক্ষ্মীকে আনিয়া পৃথিবী ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ করেন। ইনি বৃহৎ—তারা অর্থাৎ সূর্য্য কি?

(৫) "ওঝা"—চাক্‌মাদিগের সামাজিক যাজক। ভূত প্রেতাদির উৎপাত নিবারণ, রোগ প্রতীকার, গ্রামদেবতা পূজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়া কর্ম্মে ইহাদের প্রয়োজন।

অথবা দুইটি মোরগ কাটিয়া দেয়, এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ মদও ঢালিয়া দিতে হয়। তারপর একগুচ্ছ ধানগাছ "খুরুং" (৬) মধ্যে পৃষ্ঠোপায় লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতে পরিবারের সকলে "লক্ষ্মী-মা আস" "লক্ষ্মী মা আস" বলিয়া ধান্যগুচ্ছকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গৃহে লইয়া যায় এবং উচ্চস্থানে স্থাপন করে। তৎপর একখানি "মেজাং" (৭) এর উপর থালা কি পাতায় ভাত ও বলিদত্ত প্রাণীর একখানি পা ও মস্তক সাজাইয়া "লক্ষ্মামা"র সম্মুখে তুলিয়া রাখে। পরিশেষে সমাগত সকলকে পরিপাটিরূপে খাওয়ান হয় এবং প্রসাদী ভোজ্য নামাইয়া লয়।

মইন্‌ঘর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, জুমিয়াগণ বন্যপশুর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিবার নিমিত্ত জুমক্ষেত্রের মধ্যস্থিত উচ্চতম শৃঙ্গোপরি একখানি গৃহ প্রস্তুত করে, যেন তাহাতে থাকিয়া সমুদয় জুমক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করা চলে। পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে নির্ম্মিত হয় বলিয়া চাক্‌মাগণ ইহাকে "মইন্‌ঘর" (৮) নামে অভিহিত করে। ইহা তিন চারি মাসের ব্যবহারোপযোগী করিয়া অতি সামান্য ভাবেই প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু দূর হইতে সেই শৈলশৃঙ্গোপরি গৃহ অতিশয় মনোরম দেখায়। কাপ্তেন লুইন মুগ্ধভাবে বলিয়াছেন, "This Reminds one

---

সমাজের মধ্যে বহুদর্শী ও ক্রিয়া প্রণালীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই "ওঝা" নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত হইলে তাহাদের উত্তরাধিকারিগণও এই ব্যবসা চালাইতে পারে। অন্যথা সমাজ তজ্জন্য বাধ্য নহে।

(৬) "খুরুং"—বাঁশের চ্যাচারী নির্ম্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

(৭) সছিদ্র ঝুড়ি বিশেষ, ইহার উপর ভোজন পাত্র স্থাপন করিয়া আহার করা হয়।

(৮) মইন্‌-দূঁ চালো—শৃঙ্গ (উপরি অবস্থিত) ঘর।

of Isaih'is solitary lodge in a garden of cucumbers (The Hill Tracts of chittagong and the dwellers there in) অর্থাৎ "ইহা কোনও ব্যক্তিকে ঈশার শসা বাগানের মধ্যস্থিত নির্জ্জন বাসগৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়।" ফসল পাকিয়া উঠিলে জুমিয়ারা বৃদ্ধ বা নিতান্ত অক্ষমদিগকে মাত্র গৃহে রাখিয়া স্ত্রীপুত্রাদি সহ এখানে আসিয়া বাস করে। বন্যহরিণ, শূকর, কুকুর প্রভৃতির উৎপাত অতিশয় ভয়ানক, বিশেষতঃ ক্ষেত্রে দৌড়াদৌড়ি করিলে শস্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর উৎপন্ন ফসল সংগৃহীত হইলে ইহারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি।

আর্য্যজাতীয় কবিরা আদিমকাল হইতে পিতামাতার উপমা দিয়া আসিতেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই অক্ষকোটির (poleএর) সহিত। সকলেই তাঁহারা একবাক্যে পিতা'র উপমা দ্যা'ন আকাশের সহিত, মাতার উপমা দ্যা'ন পৃথিবীর সহিত। তাঁহাদের সকলের মুখে একই কথা—তবে কিনা, ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাষায়। কেহ বলেন "পিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা" (খুব সম্ভব যে, চতুর্ম্মুখের গোড়া'র কথা আকাশের চারিদিক্—চারিবেদের প্রভবরূপী চতুর্ম্মুখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; সকলেই জানে যে, চতুর্থবেদ, অথর্ব্ব-বেদের একটা উপসর্গমাত্র); কেহ বলেন "দ্যুপিতা" (Jupiter), কেহ বলেন "Heavenly Father"—সবই আকাশ-ব্যঞ্জক। লোকপ্রসিদ্ধ

শ্লোকই আছে যে, "মাতা গুরুতরাভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা"—মাতা ভূমি হইতে গুরুতর, পিতা আকাশ হইতে উচ্চতর। এটাও একটা সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক যে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" এখানে জন্মভূমির উপমা দেওয়া হইতেছে জননীর সহিত, জনকের সহিত নহে। তা ছাড়া, সর্ব্বদেশের (বিশেষতঃ আর্য্যপ্রধান দেশের) সর্ব্বলোকেই বলে পৃথিবী-মাতা, Mother earth। এ তো সকলেরই জানা কথা; কিন্তু এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটির সঙ্গে আর একটি কথা জোড়া লাগানো আছে—সেটাও বিবেচ্য। সে কথাটি জন্মভূমির কৃতী সন্তানদিগের তেজোময় প্রাণের কথা, তা বই, তাহা জন্মভূমির আদুরে ছেলেদিগের কথা নহে। সে কথা এই যে, জন্মভূমি যেমন মাতা, দেশের পিতৃ-পুরুষেরা তেম্‌নি পিতা। সে কথার ভিতরের কথা এই যে, দেশের পূর্ব্বতন এবং অধুনাতন পিতৃপুরুষদিগের প্রতাপে এবং আশীর্ব্বাদে জন্মভূমির গায়ে হাত তোলে কাহারো এতবড় যোগ্যতা নাই; সংক্ষেপে,—জন্মভূমি অনাথা জননী নহে, জন্মভূমি সনাথা জননী। বীরপুরুষেরা যখন দেশরক্ষার জন্য একজোট হ'ন, তখন তাঁহারা কচিখোকার ন্যায় "মাতা মাতা" শব্দ ধ্বনিত না করিয়া দেশের পিতৃপুরুষদিগের নাম ধ্বজপতাকায় স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত করিয়া দ্যা'ন। আমাদের দেশের সহজ প্রকৃতির লোকেরাও আপনাদের পুরাতন আমলের বসত্‌বাটীকে "পৈতৃক ভিটা" বলে—কেহই "মাতৃক ভিটা" বলে না। Patriot শব্দের মূল উপাদান পিতৃশব্দ—মাতৃশব্দ নহে। Patriotism শব্দের গোড়া-ঘাঁসা অর্থ কি? "পিতৃপুরুষদিগের প্রভাবব্যঞ্জক ভূমির প্রতি অনুরাগ"—এই তাহার মর্ম্মান্তিক অর্থ।

জর্ম্মান্‌দেশ বীরের দেশ, তাই জর্ম্মানির লোকেরা আপনাদের দেশকে "পিতৃভূমি" বলে। দেশের পিতা থাকিতে কেহ মাতার নামে দেশকে

সংজ্ঞিত করে না। উপনিবেশীরা বটে আপনাদের আদিমনিবাসকে মাতৃভূমি বলিয়া থাকে—যেমন ইংলণ্ডকে অষ্ট্রেলিয়েরা, এমন কি, মার্কিণেরাও। আমাদের দেশের যদি পিতা থাকিত, তবে আমাদের এরূপ দুর্গতি হইত না। আমাদের দেশের আমরা একপ্রকার উপনিবেশী; কাজেই আমাদের দেশকে মাতৃসম্বোধন করিয়া ক্রন্দন করা আমাদের পক্ষে শোভা পায়—কিন্তু নিশান উড়ানো নৈব চ নৈব চ! এরূপ বিসদৃশ কার্য্য সমজদার লোকের চক্ষে নিতান্তই একটা হাস্যজনক বেসুরা-কাণ্ড। দেশকে যদি পিতৃভূমি (!) বলিতে পারো তো নিশান উড়াও—না পারো তো নিশান গুটাইয়া রাখিয়া স্বদেশের যাহাতে সত্যসত্য মঙ্গল হয়, তাহাতে কোমর বাঁধিয়া লাগো; নিশান উড়ানো এখন মুলতুবি থাক্। তবে যদি স্বদেশকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা কর, তবে সে ইচ্ছার চরিতার্থতার পক্ষে মাতৃসম্বোধনই উপযুক্ত সম্বোধন, তাহা খুব ঠিক্; কিন্তু তা বলিয়া যাহার—তাহার কাছে কাঁদিয়া বেড়ানো উচিত হয় না। আমরা যদি আসল জায়গায় সত্যিকে'র কান্না কাঁদি, তবে সেরূপ কান্নায় ফল আছে; কিন্তু তাহা আমরা করিতেছি কৈ? যিনি অগতির গতি, তাঁহার কাছে ক্রন্দন না করিয়া—আমরা ক্রন্দন করিতেছি অরণ্যে। আমাদের উল্লাসও যেমন, ক্রন্দনও তেম্নি, দুইই পাত্রাপাত্র-বিরহিত, কাণ্ডজ্ঞান বিরহিত। (বঙ্গদর্শন)

দেশের ব্যথার ব্যথী।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র।

বহুবিবাহ ও সপত্নীদ্বেষ।

মহাভারতের বকবধপর্ব্বে বকরাক্ষসের দৈনিক আহারের জন্য জান-পদবর্গকে পালাক্রমে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত একএকটি মানুষ প্রদান করিতে হইত। পর্য্যায়ক্রমে যখন এই পালা কোন ব্রাহ্মণপরিবারে উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিজেকে অর্পণ করিবে, তদ্বিষয়ে বিষম তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল; সকলেই অপরের জন্য নিজের প্রাণবিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়া তদনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রী পাইতে পারিবেন, তাহার দ্বারাই আপনার ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পুরুষগণের পক্ষে বহুপত্নীকতা দোষ নহে, পূর্ব্বপতিকে উল্লঙ্ঘন করিলে স্ত্রীলোকেরই মহান্ অধর্ম্ম হয়—

> "উৎসৃজ্যাপি হি মামার্য্য প্রাপ্স্যস্যন্যামপি স্ত্রিয়ম্।
> ততঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো ভবিষ্যতি পুনস্তব॥
> ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাম্।
> স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে॥"
>
> মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৫৮।৩৫—৩৬

বহুপত্নীকতা যে দোষ নহে, তাহা আমরা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থেও ঐরূপেই দেখিতে পাই—

> "একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়।"*
>
> ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ৩।২।১২

---

* ঋগ্বেদ, ১।১০৫।৮, ৩।১।১০, ৬—৪

'একজনের বহু জায়া হয়, এক জায়ার এক সঙ্গে বহু পতি হয় না।' ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এক পতির বহু জায়ার কথা আরও পাওয়া যায়। * বেদের মন্ত্রভাগের মধ্যেও ইহার বহুল পরিচয় পাওয়া যায় † ঋগ্বেদের দুইটী সমগ্র সূক্তই এই বহুপত্নীকতার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই সূক্তদ্বয়ে অতি বিচিত্ররূপে সপত্নীদ্বেষ বর্ণিত হইয়াছে। সূক্ত-দুইটি যথাক্রমে ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের ১৪৫ ও ১৫৯ সংখ্যক।

প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রেরই ঋষি ও দেবতা আছেন। যাঁহার সেই বাক্য, অর্থাৎ যিনি ঐ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই ঐ মন্ত্রের ঋষি; এবং ঐ বাক্যদ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই ঐ বাক্যের দেবতা।

প্রথম সূক্ত ইন্দ্রাণীর, অতএব ইন্দ্রাণীই তাহার ঋষি; এবং এই সূক্তদ্বারা 'সপত্নীবাধন' অর্থাৎ সপত্নীপীড়ন প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া ইহার দেবতা 'সপত্নীবাধন'।‡

দ্বিতীয় সূক্তে পুলোমতনয়া শচী নিজেই স্তুতি করিয়াছেন, অতএব তিনিই দেবতা, তিনিই ঋষি।§

নিম্নে সূক্তদুইটীর অনুবাদ করিতেছি—

প্রথম সূক্ত।

১। যাহা দ্বারা সপত্নীকে বাধা দেওয়া যায়, যাহা দ্বারা পতিকে

---

* বিধবাবিবাহসমর্থনকারিগণের এই শ্রুতি অন্যতম অস্ত্র।

† "যদি হ বা অপি বহ্ব্য ইব জায়াঃ, পতির্বাব তাসাং মিথুনম্।৩।২।১২

‡ "ইমামিন্দ্রাণ্যুপনিষৎ সপত্নীবাধনম্—" কাত্যায়নকৃত সর্বানুক্রম।

§ "প্যৌলোমী স্বান্ গুণাংস্তত্র সপত্নীমাং প্রশংসতি।" বৃহদ্দেবতা, ৬২।

"উদসৌ" ত্বস্য পৌলোমী শচী নাম মুনিঃ স্বতঃ॥ আর্ষানুক্রমণী, ৮২

অসাধারণভাবে লাভ করা যায়, আমি সেই অতিবীর্য্যবতী লতারূপ ওষধিকে * খনন করিতেছি।

২। হে ওষধি, তোমার পত্রগুলি উত্তান হইয়া রহিয়াছে, তুমি সৌভাগ্যলাভের উপায়স্বরূপ, তুমি দেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, তুমি বলবতী, তুমি আমার সপত্নীকে দূর কর এবং পতিকে কেবল আমারই করিয়া দাও।

৩। হে ওষধি, তুমি উৎকৃষ্ট, তোমার প্রসাদে আমিও যেন উৎকৃষ্ট হই, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোক হইতেও যেন আমি উৎকৃষ্টতর হই; আর আমার যে সপত্নী আছে, সে যেন নিকৃষ্টা হইতেও নিকৃষ্টতরা হয়।

৪। আমি এই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করি না, সপত্নী-জনের উপর কেহ প্রীত হয় না, আমি সপত্নীকে দূর হইতে আরও দূরে পাঠাইয়া দিই—(স্বামীর নিকট হইতে অত্যন্ত বিযুক্ত করি)।

৫। হে ওষধি, আমি সপত্নীকে অভিভব করিতে পারি, তুমিও তাহাকে অভিভব করিতে পার; আমরা দুইজনে বলবতী হইয়া সপত্নীকে অভিভব করি।

৬। হে পতি, এই সপত্নীর অভিভবকারিণী ওষধিকে তোমার উপাধান (বালিশ) করিতেছি, সেই অভিভাকারিণী ওষধিদ্বারা আমি তোমাকে চতুর্দ্দিকে ধারণ করিতেছি—আলিঙ্গন করিতেছি; † যেমন গো বৎসের প্রতি, অথবা যেমন জল নিম্ন পথে বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার মন আমার প্রতি ধাবিত হউক। ‡

---

* আপস্তম্ব এই ওষধি 'পাঠা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, ৯।৫-

† আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র ৯।৬ দ্রষ্টব্য।

‡ অনূদিত সূক্তটির মূল এইরূপ—

"ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।

দ্বিতীয় সূক্ত।

১। এই যে সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যই উদিত হইয়াছে; তাহা আমি জানিয়াছি (অথবা, আমি পতিকে লাভ করিয়াছি), আমি সপত্নীকে অভিভব করিয়া, পতিকেও অভিভব করিয়াছি।

২। আমি সমস্ত জানি, আমি মস্তক,—সকলের মধ্যে প্রধান আমি; আমি উগ্রা হইয়া (পতিকে) আমার অভিমতই বলাই; সপত্নীগণের অভিভবকারিণী আমার বুদ্ধি বা কার্য্য অনুসরণ করিয়া পতি চলেন।

যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিদতে পতিম্ ॥ ১ ॥
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজুতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু ॥ ২ ॥
উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অথা সপত্নী বা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৩ ॥
ন হ্যস্যা নাম গৃভ্নামি নো অস্মিন্ রমতে জনে।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৪ ॥
অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫ ॥
উপ তেঽধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্রাতে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা
বারিব ধাবতু ॥ ৬ ॥”

এই সূক্তটি অথর্ব্ববেদসংহিতাতেও আছে। তৃতীয়কাণ্ড, অষ্টাদশসূক্ত দ্রষ্টব্য।

৩। আমার পুত্রগণ শক্রহননকারী অর্থাৎ বলবান্, আমার কন্যা বিশেষভাবে শোভিত, আমি সপত্নীগণকে সম্যক্ জয় করিয়াছি, পতির নিকটে আমরই যশ উত্তম।

৪। যে হবির দ্বারা ইন্দ্র কর্ম্মকর্ত্তা, যশস্বী (অথবা অন্নবান্) ও উত্তম হইয়াছেন, হে দেবগণ, আমিও তাহা করিয়াছি, এইজন্য আমি শক্ররহিতা হইয়াছি।

৫। আমি শক্রহীনা; আমি শক্রকে হনন করি, জয় করি, অভিভব করি; যেমন অস্থির লোকের ধন অন্যে হরণ করে, সেইরূপ আমি সপত্নীগণের ধন ও তেজ খণ্ডন করি।

৬। আমি সপত্নীগণকে সেইরূপ অভিভব করিয়াছি—পরাজয় করিয়াছি, যাহাতে আমি বীর—পতির ও তদীয় পরিজনের উপর বিরাজ করিতেছি।*

---

* মূল—"উদসৌ সূর্য্যো অগাদুদয়ং মামকো ভগঃ।
অহং তদ্‌বিদ্বলা পতিমত্যসাক্ষি বিষাসহিঃ॥ ১॥
অহং কেতুরহং মূর্দ্ধাহমুগ্রা বিবাচনী।
মামদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ॥ ২॥
মম পুত্রাঃ শক্রহণোহথো মে দুহিতা বিরাট্।
উতাহমস্মি সংজয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ॥ ৩॥
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃত্ব্যভবদ্ দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্না কিলাভুবম্॥ ৪॥
অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ন্ত্যভিভূবরী।
আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো রাধো অস্থেয়সামিব॥ ৫॥
সমজৈষমিমা অহং সপত্নীরভিভূবরী।
যথাহমস্য বীরস্য বিরাজানি জনস্য চ॥ ৬॥"

আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রে উদাহৃত সূক্তদুইটি সপত্নীপীড়নার্থ অনুষ্ঠেয় কার্য্যে নিম্নলিখিতরূপে বিনিযুক্ত হইয়াছে।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযোগে বধূ 'পাঠা'-নামক ওষধির সমীপে গমন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে একুশটি যব এই মন্ত্রে ছড়াইয়া দিবে—

"যদি বারুণ্যসি বরুণা ত্বা নিষ্ক্রীণামি, যদি সৌম্যসি, সোমা ত্বা নিষ্ক্রীণামি"—'যদি তুমি বরুণদেবতার হও, বরুণের নিকট হইতে তোমাকে ক্রয় করিয়া লইতেছি; যদি তুমি সোমদেবতার হও, সোমের নিকট হইতে তোমাকে ক্রয় করিয়া লইতিছি।'

পরদিন বধূ পূর্ব্বোদাহৃত 'ইমাং খনামি' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রে ঐ পাঠা উত্থিত করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রত্রয় তাহাতে পাঠপূর্ব্বক ছেদন করিয়া স্বামীর অগোচরে 'অহমস্মি সহমানা' এই চতুর্থমন্ত্রে স্বহস্তে বন্ধন করিবে এবং শেষে 'উপ তেঽধাম্' এই পঞ্চম মন্ত্রে স্বামীকে আলিঙ্গন করিবে।* ইহা করিলে স্বামী বশীভূত হয়, † ও সপত্নীগণকে বাধা প্রদান করা যায়। ‡

এইরূপ "উদসৌ সূর্য্যোঽগাৎ" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্তদ্বারা সর্ব্বদা সূর্য্যোপস্থান করিলে সপত্নীবাধনকামনা পূর্ণ হয়। §

---

* "শ্বোভূত উত্তরয়োথাপ্যোত্তরাভিস্তিসৃভিরভিমন্ত্র্যোত্তরয়া প্রতিচ্ছন্নাং হস্তয়োরাবধ্য শয্যাকালে বাহুভ্যাং ভর্ত্তারং পরিগৃহ্নীয়াদুপধানলিঙ্গয়া।" আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, ৯।৬

† "বশ্যো ভবতি"। ঐ, ৯।৭

‡ "সপত্নীবাধনঞ্চ।" ৯।৮

§ "এতেনৈব কামেনোত্তরেণানুবাকেন সদাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।" ঐ ৯।৯

অথর্ব্ববেদের কৌশিকসূত্রে উদাহৃত প্রথমসূক্তের পঞ্চম ভিন্ন অপর মন্ত্রগুলির সপত্নীজয়কর্ম্মেই বিনিয়োগ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রকার আপস্তম্ব হইতে বিভিন্ন। কৌশিকসূত্রকার বলেন—'ইমাং খনামি' ইত্যাদি প্রথমমন্ত্রে বাণাপর্ণী-(নীলঝিণ্টী ?)-পত্রের চূর্ণ দধির জল দিয়া লোহিতবর্ণের অজানামক * মহৌষধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সপত্নীর শয্যায় ছড়াইয়া দিতে হইবে; ষষ্ঠমন্ত্রের দ্বিতীয়পাদ ('উপ তেঽধাং' ইত্যাদি অথর্ব্বসংহিতাধৃত পাঠ) উচ্চারণপূর্ব্বক বাণাপর্ণীর পাতা সপত্নীর শয্যার নীচে এবং ঐ মন্ত্রের অপরাংশ পাঠ করিয়া ঐ পাতা শয্যার উপরে দিতে হইবে। †

কৌশিকসূত্রকার পঞ্চমমন্ত্রের ('অহমস্মি' ইত্যাদি) বিবাদজয় কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশানদিক্ দিয়া সভায় গমন করিলে বিবাদে (মোকদ্দমায়) জয়লাভ করা যায়। ‡ (বঙ্গদর্শন)
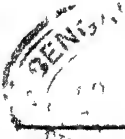
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

* "অজা মহৌষধী জ্ঞেয়া শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরা।" সুশ্রুত।

† ইমাং খনামীতি বাণাপর্ণীং লোহিতাজায়া দ্রপ্সেন সংনীয় শয়নম্ অনুপরিকিরতি। কৌশিকসূত্র, ৪।১২; অথর্ব্ববেদসংহিতা, ৩।১৮।১ সূক্তের সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

‡ "অহমস্মীত্যপরাজিতাৎ পরিষদম্ আব্রজতি।" কৌশিকসূত্র, ৫।২
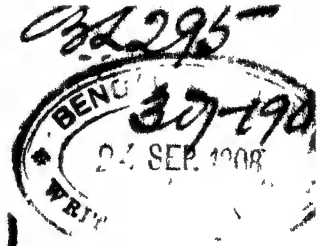
ভাণ্ডার।

তৃতীয় বর্ষ।]　　　　শ্রাবণ।　　　　[চতুর্থ সংখ্যা।

বিদ্যাসাগর।*

কালের অনন্ত আকাশে দুই একটা জ্যোতিষ্কই ধ্রুব নক্ষত্রের মত আমাদিগকে জীবনের লক্ষ্য পথে লইয়া যাইতে পারে। দুই একটা জ্যোতিষ্কই জগৎকে আলোকিত ও সঞ্জীবিত রাখিতে পারে। আজ যাঁহার পুণ্যময়ী জীবনী আলোচনা করিতে আমরা সমবেত হইয়াছি, যাঁহার পুণ্যময় জ্যোতিঃপ্রভাব আমাদের হৃদয়ে অনুভব করিতেছি, সেই মহাত্মা আজ মৃত্যুর পরপারে থাকিয়াও আমাদের জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। কবিবর Keatsএর ভাষায় বলিতে পারি

Thou hast left your soul on earth,
Thou hast soul in heaven too,
Double-lived in regions new.

বিদ্যাসাগর অমর কেন? কারণ তিনি প্রকৃত মানুষ ছিলেন। তিনি "শুধু দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ জীবিত ছিলেন"। আরও বলিতে পারি, তিনি মনঃশক্তি প্রভাবে জীবিত ছিলেন; তাই প্রকৃত জীবন তাঁহার ছিল। যেই মহাত্মা প্রকৃতরূপে জীবিত তাঁহার মৃত্যু নাই,

* ১৭শ সাংবৎসরিক উপলক্ষে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে পঠিত। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩১৪।

অথবা তিনি মৃত্যুতে অমর। অমরতায় মৃত্যুকে জয় করিয়া চিন্ময় দেহে আমাদের অন্তরাকাশে বিরাজমান। মৃত্যুও তাঁহার মহীয়ান্ আলোকে উজ্জ্বল। আর তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁর ভক্তগণের—সমস্ত বাঙালীর অন্তরলোকে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের লাঞ্ছিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্র পৌরুষের এক মহান্ আদর্শ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পরাধীন পতিত দেশেও তিনিই স্বাধীনতার মূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। তাই তাঁহাকে একক দেখিতে পাই। সেই মহান্ জ্যোতিষ্কের আর সমান ধর্ম্মী ছিল না। তাই তিনি একা; গগনোপরি সূর্য্যের মত একা, নৈশ গগনে চন্দ্রের মত একা। আর গাঢ় তিমিরাবৃতা রজনীতে ছায়াপথের মত তাঁহার জীবন ধারা অনন্তের অন্তর হইতে আসিয়া আমাদিগকে অখণ্ড মনুষ্যত্বের স্বাধীনতার পথ দেখাইয়া দিয়া এক মহান্ অনন্তে চলিয়া গিয়াছে—একা, এক পথ। তাঁহার জীবনের আলোকের কাছে আর সমস্ত বঙ্গবাসী প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক গুণ ছিল। বঙ্গদেশের সামাজিক সঙ্কীর্ণতা তাঁহার জীবনের উচ্ছ্বসিত বেগকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার জীবন-ধারা সুনির্ম্মল উৎসের মত সামাজিক কঙ্করময় ক্ষুদ্রতাজাল, ভেদ করিয়া উর্দ্ধ, জ্যোতির্ম্ময় আকাশে উঠিয়াছিল ও তাহা চতুর্দ্দিকস্থ জন সমূহকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিত। বাঙ্গালীর ও মানবের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা সমস্তই যেন তাঁহার পদতলে ছিন্ন হইয়া ঝড়িয়া পড়িয়াছিল। তিনি বৃহৎ মহীরুহের মত সংসারের প্রখর রৌদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝা ঝড় স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াও জীবন পথে শ্রান্ত তপ্ত ক্ষুধিত দরিদ্র পথিকগণকে স্নিগ্ধ ছায়া ও ফলদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

আজ এই দুর্দ্দিনে তাঁহার মহান চরিত্রের মৃত্যুহীন মহীরুহ ছায়ায়—যাহা সমস্ত বাঙ্গালীর তীর্থ স্থান হইয়া গিয়াছে—সেই পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। এখানে আসিয়া সেই মহান আলোকের সম্মুখে আমাদের জীবনের সমস্ত মোহ, সমস্ত নিরানন্দ, সমস্ত অবসাদ অপসৃত হউক্। আজ আমরা সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ, সমস্ত জড়ত্বজাল ছিন্ন করিয়া অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছি।

১৭১৭ শকের ১২ই আশ্বিন মধ্যাহ্নে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র, অথবা তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়ের তৎকালীন ভাষায় বলিতে গেলে, সেই "এঁড়ে বাছুর" জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছিলেন।

যেই পুণ্যক্ষণে অমরাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত দীনা বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন সেই পুণ্য মুহূর্ত্তকে নমস্কার করি। সেই পুণ্যময়ী জননী—তাঁহার প্রসূতি—তাঁহার চরণেও প্রণাম।

বিদ্যাসাগর জীবনী আলোচনা করিবার প্রাকালে তাঁহার জননী—সেই অসামান্যা রমণী ভগবতী দেবীর কথা প্রথমতঃ আলোচনা করা আবশ্যক।

সেই অসামান্যা রমণী—তাঁহার চিত্র আপনারা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন—কল্যাণ ও শান্তির আধারভূতা ছিলেন। তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত ললাট, স্নিগ্ধ মুখশ্রী, স্নেহ সকরুণ নয়ন যুগলের গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য আমাদের হৃদয়কে বহু ঊর্দ্ধে লইয়া যায়; ইহাতে সহজেই বুঝা যায় কেন বিদ্যাসাগরের একমাত্র আরাধ্যা দেবতা তাঁহার জননীই ছিলেন।

দয়ার সাগর মাতৃস্তন্যের সহিত তাঁহার মাতৃ হৃদয়ের ক্ষীরীভূত স্নিগ্ধ গুণ রাশিও যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া ছিলেন, তাহাতে আর

সন্দেহ নাই। তাঁহার মাতার দয়া, স্নেহ ও মমতায় যে তাঁহার হৃদয় গঠিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনী আলোচনায় সহজেই প্রমাণিত হইবে।

ভগবতী অজস্র করুণা সিঞ্চনে তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিতেন। রোগাতুরের সেবা ক্ষুধাতুরকে অন্নদান তাঁহার নিয়মিত কার্য্য ছিল। তাঁহাদের বীরসিংহস্থিত গৃহ যখন অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জননী দেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু জননী বলিয়াছিলেন "যে সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, তাহারা কি খাইয়া অধ্যয়ন করিবে ?" (শম্ভু বাবুর প্রণীত জীবনী ২০০ পৃঃ)।

ভগবতীর দয়াতে একটা অসাধারণত্ব ছিল—তাহা সংস্কারাবদ্ধ ছিল না। তাহা চতুর্দ্দিক প্রসৃত আলোকের মত সর্ব্বব্যাপী ছিল। তিনি তাঁহার হৃদয়ের আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রভাবে সামাজিক ক্ষুদ্র প্রথা-জাল ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণতন্ত্রী বিশ্বধর্ম্মের রাগিণীতে বাঁধা ছিল বলিয়া, তিনি মানবের সেবাকে দেবতার পূজা অপেক্ষাও বেশী মনে করিতে পারিয়াছিলেন। বিধবাদের কষ্টে তাঁহার হৃদয় কতদূর বিগলিত হইয়াছিল তাহা একটা উদাহরণে পরিস্ফুট হইবে। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—"১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবাকামিনীর বিবাহ কার্য্য সমাধা হয় ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান ছিলেন। উঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ

ঘৃণা করে এ কারণ জননী দেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।" (১৯৯ পৃঃ)

এই সকল উদাহরণ হইতে প্রকৃষ্টরূপে বুঝা যায় বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতৃচরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছিল। এই দুই জীবনের সমগ্র আলোকের দিকে যদি আমরা মানসনেত্র পাত করি, তবে দেখিতে পাই যে মাতৃপদতলে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষায় রত। মাতার স্নেহধারার ভিতর দিয়া মাতৃ হৃদয়ের অসীম গুণরাশিও তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। আরও দেখিতে পাই, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার মাতার স্নেহালোকবর্ষি স্নিগ্ধ নয়ন যুগল হইতে করুণার অংশলাভ করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার হৃদয় ছাপাইয়া জগৎকেও প্লাবিত করিয়াছিল।

আজ আমরা এই পুণ্যক্ষণে—আমাদের মানসলোকস্থিত সর্ব্বজন-পূজ্য মাতৃপুত্রচিত্রের সম্মুখে আমাদের মস্তক অবনত করি।

তিনি

বাল্যকাল হইতেই তেজস্বী ও স্বাধীন চেতা ছিলেন; বাল্যজীবনেই ভাবীজীবনের চিত্র দেখা যায়। তিনি বাল্যকালে অন্য কাহারও কথা অনুসারে চলিতেন না। এমন কি, তাঁহার পিতা তাঁহাকে যেরূপ করিতে বলিতেন, তিনি ঠিক তার উল্টা করিয়া বসিতেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার সেই ভাব বুঝিতেন, ও তাঁহাকে সেই ভাবে চালাইতেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের একটা উদাহরণে দেখা যাইবে যে, যে তেজ যে মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন তাহা ক্ষণিক উচ্ছ্বাসমাত্র ছিল না; তাহা তাঁহার সমস্ত জীবন-ব্যাপী ছিল।

একবার তিনি হিন্দু কলেজের (Principal) প্রিন্সিপাল "কার"

সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; সভ্যতাভিমানী ইংরেজ তাঁর সবুট পদদ্বয় টেবিলের উপর রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতে ভুলিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে "কার" সাহেব কার্য্যোপলক্ষ্যে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও চটিজুতা সমেত তাঁহার সর্ব্বলোক-পূজ্য পদদ্বয় টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া অহঙ্কৃত ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আত্মসম্মান বজায় রাখিতে কখনও অবহেলা করেন নাই। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তিনি বড় চাকুরী ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তাহা সর্ব্বজন বিদিত।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসও তাঁহার মানসিক শক্তির ও তেজের একান্ত পরিচায়ক। দুই বেলা রন্ধনাদি করিয়া সকলের খাওয়ার পর উচ্ছিষ্টযুক্ত বাসন ধৌত করিয়া আরও অন্যান্য গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া —তিনি অনেক সময় সময়াভাবে স্কুলে যাওয়ার পথেও পাঠাভ্যাস করিতেন। শরীরের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া কঠোর পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

শুধু বিদ্যার দিক হইতে নহে, তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আলোচনায় তাঁহার হৃদয়ের অসীম তেজের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দানস্পৃহা আশ্চর্য্য রকমের ছিল। অত্যন্ত দুরবস্থায় থাকিয়াও তিনি তাঁহার মাসিক (জলপানির) বৃত্তির দ্বারা দরিদ্রকে দান করিতেন। এমনও দেখা গিয়াছে, "তিনি অন্যের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে নিজে গামছা পরিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছেন।" ইহা দয়ার সাগরের ভবিষ্যজীবনের আভাষ মাত্র।

এই ভাব পরিস্ফুট হইয়া শেষে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আর

একটা উদাহরণে পরিস্ফুট হইবে। তাঁহার করুণা সরল—সবল—নির্ব্বিকার। ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিও তাঁহাকে রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। শুনিয়াছি—একদা এক নিঃসহায়া পথিপার্শ্বে পরিত্যক্তা কলেরা রোগাক্রান্ত মেথর রমণীকেও তিনি সযত্নে সেবা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, ভগবানের এক বিন্দু করুণা ঈশ্বরচন্দ্ররূপে কঠিন পৃথিবী তলে পড়িয়াছিল। ইহাতে আরও প্রমাণিত হয়—প্রকৃত দয়া পুরুষের ধর্ম্ম—প্রকৃত দয়া দেখাইতে গেলে প্রকৃত আত্মত্যাগের উপযুক্ত হৃদয়শক্তির প্রয়োজন।

তিনি শুধু পুরুষের নহে, নারীজাতিরও একান্ত পূজার পাত্র। নারীজাতির জন্য তিনি যেরূপ আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সংসারে অতি বিরল। বেথুন কলেজ স্থাপন করা উপলক্ষ্যে তিনি বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। আর তিনি বিধবা রমণীদের জন্য যে সামাজিক যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহা তাঁহার দৈবী শক্তির একান্ত পরিচায়ক। করুণার ও মনুষ্যত্বের দুইটি ধারা যে তাঁহার হৃদয়ে প্রবহমান ছিল তাহা এই যুদ্ধেই প্রমাণিত হইয়াছিল।

এই মহাপুরুষের আর একটা কীর্ত্তি মেট্রোপলিটান্‌ ইন্‌ষ্টিটিউসান্‌ বাঙ্গালীর আত্মচেষ্টায় ও নিজের অধীনে উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাকে স্থায়ী করিয়া তিনি এক মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি "যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা ছিলেন, যিনি লোকাচার রক্ষক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন।"

এইরূপে ইংরেজী বিদ্যাকে স্বদেশ ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া তিনি

তাঁহার কর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি এই কীর্ত্তিস্তম্ভই তাঁহার স্বদেশকল্যাণকামনা প্রকটিত করিতেছে।

তাঁহার জীবনের আর একটা প্রধান কীর্ত্তি বাঙলা সাহিত্য। তিনি শুধু সংস্কৃত শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমাদের মাতৃভাষা—বাংলা ভাষাকে উন্নত করা দরকার। ভাষা না হইলে—ভাব—ও জাতীয় চরিত্রের উন্মেষ হইতে পারে না; তিনি তখনকার সদ্যজাত বাঙলা গদ্যকে শব্দসম্পদে ও ভাব সম্পদে গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি একজন বিশেষ সাহিত্যশিল্পি ছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, যাহা বক্তব্য তাহা "সরল, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল" করিয়া ব্যক্ত করিতে না পারিলে তাহা ভাষা হইতে পারে না; সেই ভাষার মধ্য দিয়া একটা ভাবস্রোত প্রবাহিত করাইতে না পারিলে তাহা সাহিত্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। বাঙলা গদ্য সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এক বেদীতে দাঁড়াইবার প্রথম সোপান তিনিই তৈয়ারী করিয়া দিয়া ছিলেন।

তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার সমগ্র জীবন প্রকৃত মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক দিকে তাঁহার দয়া, অপরদিকে তাঁহার নির্ভিক তেজস্বীতার বলে একমাত্র অজেয় পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ আমরা এখানে তাঁহার অটল সারল্যময় চরিত্র পূজা করিতে সমবেত হইয়াছি। নিজের মাতৃ হস্ত প্রস্তুত মোটাবস্ত্র—"মাতৃস্নেহ মণ্ডিত দারিদ্র্য"—তিনি আজীবন সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া—এমন কি রাজদ্বারেও যাহা উপযুক্ত সম্মান পাইয়াছে—তিনি তাঁহার উন্নত-কঠোর আত্ম সম্মানকে ঊর্দ্ধে রাখিয়া আপন আত্মনির্ভর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের

মহান্ আদর্শ বাঙালীর হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার সেই "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া সমস্ত বাঙালীকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া এক মহানক্ষণে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আজ আমরা সেই মহান্ আত্মার পূজা করিতে আসিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আজ একদিনের জন্য তাঁহার পূজা করিয়া আমাদের জীবন ধন্য ও পবিত্র জ্ঞান করিতেছি, এবং প্রকৃত-রূপে তাঁহার স্মৃতিকে মস্তকে ধারণ করিয়া, আমরা তাঁহার মনুষ্যত্বের, তাঁহার আদর্শ চরিত্রের পূজা করিলেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত সম্মান করা হইবে তাহা আমাদের (ছাত্রসমাজের)—কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সমস্ত চেষ্টায় সমস্ত অন্তরায়ের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু পর-পারস্থিত—ও এ মুহূর্ত্তে আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার চিন্ময় দেহের শাশ্বত শুভ্রজ্যোতিঃ আমাদিগকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম করিয়া তুলিবে। তাঁহার শুভ্র চরিত্রই ধ্রুব নক্ষত্রের মত সমগ্র জীবনপথে আমাদিগকে লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত করিবে।

শ্রীরঞ্জনলাল সেন।

কথকতা।

ধর্ম্মই হিন্দুর প্রাণ। প্রাতরুত্থান হইতে নিশীথ সময়ে শয্যায় শয়ন করা পর্য্যন্ত সমস্ত সময় হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়। শয়নে-ভোজনে, গমনে, প্রতিপদক্ষেপেই শাস্ত্রীয় শাসন অবশ্য প্রতিপাল্য। শাস্ত্রকারগণ যে সকল সুমধুর উপদেশ দান, ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সেইমতে চলিলে —চরমে পরম পদপ্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন দেশে, কোন ধর্ম্মে এমন সুব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। হিন্দুর শাস্ত্রই সর্ব্ব প্রথমে "একমেবাদ্বিতীয়ং" উল্লেখ করিয়াছিল। সেই মূল সূত্রাবলম্বনে অন্য একটী ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র "অহিংসা পরমঃ ধর্ম্মঃ" উক্তি করিল, তাহার কতদিন পরে সেই মতানুসারে একটি নূতন ধর্ম্ম দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে দেশে তাহার নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া কতশত লোককে নবজীবন প্রদান করিয়াছিল, কতশত লোকের মানস নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল।

কালের অচিন্তনীয় প্রভাব! তাহার দুরতিক্রমণীয় শক্তি বলে বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। বেদের নাম শ্রুতি, উহা অপৌরুষেয় ও নিত্য। গুরু পরম্পরায় ঋষি হইতে ঋষির নিকট শ্রুতির অপ্রতিহত শক্তি প্রচারিত হইতেছিল। ক্রমে মানবের স্মৃতি ও ধারণা শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল, আর বৈদিক তত্ত্ব দিন দিন অল্প পরিমাণে আলোচিত হইতে লাগিল। তখন তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ উহা লিপিবদ্ধ করিলেন,—বৈদিক গ্রন্থ প্রচারিত হইল। ক্রমে বড়

দর্শনও উপনিষদ্ প্রচারিত হইয়া বৈদিক গবেষণা মানবের আয়ত্তীভূত হইবার সুবিধা হইল। জটিল পথ সকল সহজগম্য হইয়া পড়িল। কিন্তু দর্শন শাস্ত্র কয়জন লোক বুঝিতে সমর্থ হইবে? সময়ের গতিতে মানবের মানসিক শক্তির প্রভাব হ্রাস হইল। তখন সমাজ মধ্যে নানা প্রকার ব্যভিচার ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। বৈদিক ধর্ম্ম লোপ পাইবার সম্ভাবনা দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ দয়াল ঋষিরা বিচলিত হইলেন, তাঁহারা—মানবগণ যাহাতে সহজে সরল ধর্ম্মতত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিয়া পুণ্যকর্ম্ম সকল সমাহিত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে পৌরাণিক কাল আসিল। উপাখ্যান রচনা করিয়া সরল ভাষায় সরল ভাবে লোকের মনে বৈদিক উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রসমূহের তত্ত্বমালার বীজবপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ কর্ত্তা। তিনি চারিবেদ সঙ্কলন করিয়াছেন বলিয়া আবহমান কাল এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। আবার সেই বেদব্যাসই পুরাণ সমূহের রচয়িতা। ব্যাসদেব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত মত প্রচারিত আছে। পুরাণগুলি যে এক সময়ে একজন কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই, উহা বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দ্বারা রচিত, তাহা ঐ সকল পুরাণ পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। এক পুরাণের মতের সহিত অন্য পুরাণের মতের সর্ব্বতোভাবে মিল ও সামঞ্জস্য নাই।—এক ব্যক্তি এক সময়ে ঘোরতর বিষ্ণুভক্ত, আবার সেই ব্যক্তিই অন্য সময়ে বিষম শৈব, পক্ষান্তরে তিনিই আবার শাক্তকুলচূড়ামণি; আবার তৎক্ষণাৎ গাণপত্য মতের দৃঢ়তা সম্পাদনে যত্নশীল। অন্য সময়ে তিনিই সৌর উপাসক হইয়া নিজের হৃদয়কে তন্মতে বিলীন করিতে উৎসুক। তাহার পর পুরাণগুলির

ভাষার রচনা দৃষ্টি করিলে তাহা এক সময়ে এক জনের লিখিত বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ রচনা করিয়াছেন, ইহা পুরাণ পাঠে সহজেই অনুমিত হয়। পুরাণের ভাষা ও ধর্ম্মমত এই বিষয়ে প্রবীণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বতন ঋষিগণের অনেকের প্রকৃতি এমন ছিল, যে তাঁহারা স্বীয় নাম প্রচারে তত ব্যগ্র ছিলেন না বা তাঁহাদের মত প্রচার করিলে লোক সহজে গ্রহণ করিবে না এই আশঙ্কায়, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রন্থ বা শ্লোক-মালা অন্যের নামে প্রচারিত বা অপরের গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য একখানি পুরাণ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতও দৃষ্ট হয়। এইরূপে পুরাণ সমূহের প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশের সমাবেশও দৃষ্টি করা যায়।

মহাপুরাণ অষ্টাদশ। উপপুরাণ অসংখ্য; ঋষিরা পুরাণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশ মন্বন্তরাণিচ।"
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত এই পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন গ্রন্থই পুরাণ নামে পারচিত। পুরাণগুলির নাম এই :—

"মদ্বয়ং ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ং ব চতুষ্টয়ং।
অনাপলিঙ্গ কূস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্॥"

এই অষ্টাদশ পুরাণ। পুরাণগুলির আদ্যক্ষর লইয়া এই কবিতাটী রচিত। মদ্বয়ং—মৎস্য ও মার্কণ্ডেয়; ভদ্বয়ং—ভাগবত ও ভবিষ্য; ব্রত্রয়—ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত; ব চতুষ্টয়ং—বিষ্ণু, বামন, বায়ু ও বরাহ; অ—অগ্নি, না—নারদীয়; প—পদ্ম; লিং—লিঙ্গ; গ—গরুড়, কূ—কূর্ম্ম; স্ক—স্কন্দ। এই অষ্টাদশ পুরাণ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

অন্য মতে বায়ু পুরাণের নাম দৃষ্ট হয় না—তন্মতে শিবপুরাণ গৃহীত হইয়াছে। উপপুরাণ সমূহের নাম কত করিব।

মহাভারতও বেদব্যাস বিরচিত। উহা পঞ্চম বেদ নামে বিখ্যাত। এমন কি ঋষিগণ চারিবেদ অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব অধিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—সেই জন্য উহার নাম মহাভারত দিয়াছেন। মহাভারতে সর্ব্বশাস্ত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। মহাভারত পাঠ করিয়া মোক্ষ লাভ হয় এইরূপ ফল শ্রুতি আছে। রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। তিনি অতি সুললিত ভাষায় রামায়ণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সংহিতাগুলি হিন্দুদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র। উহাই সে কালের আইন এবং তৎকালে ঐ আইন মানিয়া সকলকে চলিতে হইত। অদ্যাপি মনুর ব্যবস্থা অনেক স্থলে অলঙ্ঘ্য।

সংহিতার সংখ্যা বিংশতি। তাহাদের নাম—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যজ্ঞ-বল্‌ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। ঋষিরা স্ব স্ব নামানুসারে এক এক খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মানবগণের সাংসারিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, কুশল সংসাধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রকারগণ ত ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রচার না হইলে ত তাহার ফললাভ হয় না। শাস্ত্রগুলি সংস্কৃত রচিত। দেশের সকলে কিন্তু সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ নহে। বিশেষতঃ পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই। কাগজও এত সুলভ ছিল না। যাহারা পরে শিক্ষক ও উপদেষ্টা হইলেন, তাঁহারা স্বীয় গুরুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছিলেন। গুরুর হস্তলিখিত তেরেট, তাল বা ভূর্জ্জ পত্রের পুঁথি দেখিয়া লিখিয়া লইয়া শিক্ষা করেন, তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার

গুরুর নিকট উপদেশ ও পুথি নকল করিয়া শিখিতেন। এইরূপে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি সুদূরপরাহত। লোক-শিক্ষার পথ প্রসারিত না হইলে, সাধারণ মানবমনে ধর্ম্মালোক দীপ্ত না হইলে, দেশের অধোগতি ও শোচনীয় দশা প্রাপ্তি অনিবার্য্য। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অগাধ ও অপার; এক ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া, বেদ, পুরাণ, সংহিতা, দর্শন, তন্ত্র, নিগম আগমাদি শাস্ত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করা বিষম দুঃসাহসিকের কায। পল্লব গ্রাহিতা জন্মিতে পারে, কিন্তু পাণ্ডিত্য জন্মান সুকঠিন। সেই জন্য ঋষিরা পুরাণ পাঠও শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষিগণ সূতপুত্র লোমহর্ষণের মুখে পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইযাছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইলেও পুরাণ শ্রবণে পরম উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত ছিলেন। সেই সময় হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। মহর্ষি বাল্মীকি স্বরচিত রামায়ণ কুশীলবকে শিক্ষা দিয়া কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে সমবেত নৃপতি বৃন্দকে তাহা শ্রবণ করান; অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রও সেই বালককণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর রামায়ণ গান শ্রবণে মোহিত হইয়াছিলেন। রাজাপরীক্ষিৎ ঋষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন—সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাকে তক্ষকে দংশন করিবে। তিনি সেই সময় পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতটে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া শুকদেব মুখে পুরাণ কথা শ্রবণে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তৎপরে তৎপুত্র মহারাজ জন্মেজয় সর্পসত্রে সর্পকুল নির্ম্মূল করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, সেই পাপানলে তাঁহার মানস নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তিনি নির্ধৌত কল্মষ হইবার নিমিত্ত পুরাণ শ্রবণ

করেন। এস্থলে শুকদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন বক্তা, রাজা জন্মেজয় শ্রোতা।

এইরূপে ঋষিরা পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য লোকেও ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মোপদেশ পাইত। সেই প্রথাই ক্রমে বঙ্গদেশে কথকতার সৃষ্টি করিয়াছে। কথকতার মাধুর্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। দেশের নরনারীকে ধর্ম্ম কর্ম্মে মাতাইতে, মনের মালিন্য বিদূরিত করিতে, পবিত্র শান্তিরসে হৃদয় পরিপ্লাবিত করিতে, ইহাতে আলৌকিক শক্তি নিহিত আছে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

✓যদিও আমরা বঙ্গদেশে কথকতা প্রচারের ঠিক্ আদিকাল নির্ণয় করিতে পারি না এবং প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মার নামও অবগত হইতে পারি নাই তথাপি ইহা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরুপরম্পরায় দেশ মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল সংস্কৃত পুরাণ পাঠের অনুকরণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রের পর যখন তিনি মহাভারত শ্রবণ করেন, তখন তাহা সংস্কৃত ভাষায় কথিত ও গীত হইয়া থাকিবে। তখন বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি না হওয়াই সম্ভব। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব কবিগণ মধুর পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গ ভাষার অঙ্গপুষ্টি ও সৌষ্ঠব সাধন করেন। সেই সময়ে লোকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাব উদিত হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ যে পদরাজি রচনা করেন, কালক্রমে তাহাই গীত হইয়া মধুময় কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়। রামায়ণ, চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতিও এইরূপে গীত হইয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল। লোকে হরিনামে মাতিয়াছিল। পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি অসাধারণ ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়া বাঙ্গালীদিগকে নবজীবন প্রদান করিতেছিল।

কথকতা তাহার পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কীর্ত্তন, চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত প্রচারিত হইবার পর চলিত হয়। তিনিই উহার প্রবর্ত্তক। তাহার পর উহাতে ক্রমে ক্রমে অনুরাগ সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। কীর্ত্তনে বা রামায়ণাদি গানে বাদ্য সংযোগ হইয়াছে। একজনে প্রথমে গান গাহিয়া থাকে, তাহার পরে অপর কতকগুলি গায়ক সেই গীত পদটীর পুনরাবৃত্তি করিয়া সুর তাল মান লয় বজায় রাখিয়া গানের জমাট বাঁধিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খোল বাজাইয়া জমজমা বাধায়। রামায়ণাদি গানে মূল গায়ক প্রথমে যে পদটী চামর সহযোগে গান করেন, তাহার দোয়ারেরা তাহাই গান করে, এবং পদে নূপুর পরিধান করিয়া পাদসঞ্চালন সহকারে উহার ধ্বনি করিতে থাকে। উহাকে নৃত্য বলিতে হয় বলিতে পার তাহাতে আপত্তি নাই।

কথকতার প্রকৃতি অন্যরূপ। ইহা একজন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত হয়, ইহাতে নৃত্য বাদ্য নাই। মধ্যে মধ্যে সুস্বর সংযোগে, তাল মান লয়ের সহিত বিবিধ রাগ রাগিণীতে গান সকল গীত হয়। বক্তাকে বহুবিধ অভিনয় করিতে হয়। তিনি কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন দীন হীন কাঙ্গাল, কখন রাণী, কখন দাসী, কখন সাধু, কখন চোর, কখন মাতাল, কখন লম্পট, কখন ভাঁড়, কখন নট, কখন নর্ত্তকী, কখন বেশ্যা, কখন ব্রাহ্মণ, কখন চণ্ডাল, এইরূপ বহুরূপীর সাজে সজ্জিত হইতে হয়। অথচ তিনি কখন বেশপরিবর্ত্তন বা নেপথ্যে গমন করেন না। বেদীতে বসিয়া একবেশে, এক ভাবে থাকিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করা বড় সহজ কাজ নহে। আদি রসের অভিনয় করিতে করিতে তাহাকে হয় ত করুণ রসের অবতারণা

করিতে হয়, পরক্ষণেই বীররসের সমাবেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে। তৎসঙ্গে অদ্ভুত রসের মিলন না করিলে হয় ত সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের চিত্তবিনোদন দুর্ঘট হইয়া পড়ে। আবার সেই সময়ে হয় ত শান্ত রসের বর্ণনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্র বা ভয়ানক রসের আয়োজন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

নানাবিধ রাগ রাগিণীর জ্ঞান, সুরবোধ ও তালমানলয়ে দক্ষতা না থাকিলে কথক কখনই শ্রোতৃবর্গের মনোবিমোহনে সমর্থ হন না। তাঁহার স্বর সুমিষ্ট না হইলে কথিত বিষয় অত্যন্ত কর্কশ ও শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। তিনি যখন যাহার বিষয় অভিনয় করিবেন তাহার অঙ্গভঙ্গী, কথার স্বরাদি অবিকল অনুকরণ করিতে হয়। স্ত্রীলোকের বিষয় অভিনয় করিতে যাইয়া তাহাদের সমুদয় প্রকৃতি যথাযথ বর্ণনা করা একজন পুরুষের পক্ষে কত কঠিন, যিনি উহা না করিয়াছেন, তিনি তাহা কখন অনুভব করিতে পারিবেন না। যখন যে বিষয় অভিনেতব্য হইবে, শ্রোতৃগণ তাহা শুনিয়া মনে করিবেন, সে বর্ণনীয় ব্যক্তি নিজে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে। এক এক সভাতে স্ত্রী পুরুষে সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন, সকলের রুচি স্বতন্ত্র, সেই সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়া তন্ময় করিয়া রাখা যাহার-তাহার সাধ্য নহে। সেই জন্য কথকতার কাঠিন্য এত অধিক বলিয়া অনুভব করি।

বঙ্গদেশে পূর্ব্বে অনেক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কথক বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে দেশের শীর্ষ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে সম্মান সহকারে সমাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা রাজসভাসদরূপে গৃহীত ও রাজ সম্মানে বিভূষিত

হইতেন। এখন সে দিন গিয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক সময়ে এ দেশের লোকের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনিও বাকুড়াসোণামুখী নিবাসী কথকচূড়ামণি গদাধর শিরোমণির কথা আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করিতেন এবং দেশবাসীদিগকে শুনাইতেন। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ১৭৭৩-১৭৮৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে এদেশে কথকতার প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহার পূর্ব্বেও উহার সত্ত্বা ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালা ভাষায় দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এ উভয় গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া আদ্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলে জানা যায়, যে উক্ত পুস্তক দুই খানি রচিত হইবার সময়ে এদেশে কথকতার প্রচুর প্রচলন ছিল। কাশীরাম সম্বন্ধে এত দিন লোকের ধারণা এইরূপ ছিল যে তাঁহার সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা ছিল না। জানিতেন না এ কথা কেহ বলে নাই, তথাপি এক্ষণে তাঁহার সংস্কৃতে পারদর্শিতার প্রমাণ প্রয়োগ করা হইতেছে। হউক তাহাতে ক্ষতি নাই; তিনি সংস্কৃতে অসাধারণ পণ্ডিত হইলে আমাদের যে গৌরব, আর না হইলে যে সে গৌরবের হানি হয় এমন মনে করি না। কারণ তাঁহার কীর্ত্তি অসাধারণ ও অবিনশ্বর। তাঁহার রচিত সুললিত প্রাসাদগুণবিশিষ্ট বাঙ্গালা পদ্য মহাভারত বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে অতুলনীয় অমূল্য রত্নরাজি সদৃশ। যাহা হউক, তাঁহার মহাভারত মূল সংস্কৃত হইতে অনুদিত এ কথা বলিলেও তাহা যে একেবারে দেশপ্রচলিত বহুজনগৃহীত মত হইতে একেবারে উদ্ধার পাইবে তাহা আমরা মনে করি না। কারণ তাঁহার কৃত মহাভারতের পূর্ব্বভাগ মূলানুযায়ী নহে। তাঁহার বর্ণিত ভাষা অনেক স্থলে মূলের সহিত মিলে না। এ বিষয়ে সকল অংশের

উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নহে। তবে দুই একটা কথা বলিতে হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতে ভীষ্মের আবির্ভাব নাই। তিনি লক্ষ্য ভেদ করিতেও উঠেন নাই। কাশীদাস বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সভাতে আনিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে উদ্যত করাইয়াছেন, তবে শিখিণ্ডীকে আনাইয়া তাঁহার সম্মান রাখিয়াছেন। তাহার পর কর্ণকে লক্ষ্যভেদে নিযুক্ত করিয়া বাণক্ষেপ পর্য্যন্ত করাইলেন। সেই সময়ে ভগবানের অবতার কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় সুদর্শন চক্র দ্বারা রাধাচক্রের ছিদ্রপথ আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে সভাতলে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করিলেন—এইরূপ বর্ণনা মূলে নাই। মূলে, দ্রৌপদী স্পষ্টাক্ষরে সভা মধ্যে বলিলেন,—“আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।” কত পার্থক্য বিজ্ঞজনে বুঝিয়া দেখুন। এই উভয় স্থলই কথকদিগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাহার পর বনপর্ব্বে শ্রীবৎস উপাখ্যান মূলে নাই। শ্যেন কপোতের উপাখ্যান নাই। প্রহ্লাদ চরিত্রও নাই। অকালে অপূর্ব্ব আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ ব্যাপারও লক্ষিত হয় না। এগুলি কথক ঠাকুরদিগের মুখে শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। শান্তি পর্ব্ব এক নূতন ব্যাপার। উহার সহিত মূলের মিল নাই বলিলে অসঙ্গত হইবে না। উহাও কথকদিগের প্রমুখাৎলভ্য বলিয়া অনুমান করি। অনুশাসন পর্ব্বের নামোল্লেখও দৃষ্ট হয় না। কাশীরামের গ্রন্থ বঙ্গাব্দ ৯৭৫-১০১১ সালের মধ্যে লিখিত এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী প্রকাশিত বাঙ্গালা কাশীদাসী মহাভারতে এই মত সমাহৃত হইয়াছে। সুতরাং তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কথকতা প্রচার ছিল, তাহার সংশয় থাকিতেছে না।

কৃত্তিবাসরামায়ণখানি কাশীদাসের পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সে অনুমান অসঙ্গত নহে। তাঁহার রামায়ণ মূল বাল্মীকি কৃত রামায়ণের সহিত অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহার বাল-কাণ্ডে দশরথ রাজাকে একটী ভীরু কাপুরুষ বর্ণনা করা হইয়াছে। দশরথ রাজা যে সূর্য্যবংশীয় নরপতি তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের বালকাণ্ড পাঠে আদৌ উপলব্ধি হয় না। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষার্থ রামচন্দ্রকে চাহিলেন; তিনি অপত্য স্নেহের বশীভূত (তাহাই বা বলি কিরূপে ?) হইয়া রাম লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে ভরত শত্রুঘ্নকে প্রদান করিলেন। ভরত শত্রুঘ্ন যেন তাঁহার পুত্র নহে। তাহাদিগকে রাক্ষসে মারিয়া ফেলিলে যেন তাঁহার হৃদয়ে পুত্র শোকশেল বিদ্ধ হইবে না। তাহার পর বিশ্বামিত্র সদৃশ একজন তেজস্বী ঋষির সহিত প্রতারণা করা তাঁহার রাজধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের পবিত্র কুলধর্ম্ম এই খানেই চিরকালের জন্য যে অস্তমিত হইতেছে; তাহা তাঁহার মনোমধ্যে একবার উদিত হইল না, ইহাও বড একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। অথচ রাজা দশরথ একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বহুবিধ সদ্গুণশালী রঘুবংশীয় নরপতি। অন্যান্য কাণ্ডে এইরূপ অনৈক্য আছে। দেবরাজ ইন্দ্রও অহল্যার প্রতি গৌতমের অভিশাপ প্রদান সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিত মতের সহিত মূল বাল্মীকি রামায়ণের কোন মিল নাই। মূলে অহল্যা গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে জানিতে পারিয়াও তাহার সহিত একত্র বাস করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইন্দ্রের গৌতমের শিষ্যত্ব স্বীকার ও সহস্র যোনিত্ব প্রাপ্তির কোন উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে মত লিখিত তাহা অন্য পুরাণ হইতে গৃহীত; কথকেরা বিবিধ পুরাণ পাঠ করিয়া তাহার যে যে অংশ

লোকের চিত্তরঞ্জক বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাই রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। দেশের প্রচলিত মতের উপেক্ষা করিতে কবি সাহসী হন নাই। এ দেশের লোকের আজন্ম একটা সংস্কার আছে, যে পবননন্দন জানকীর অন্বেষণে লঙ্কাধাম গমন করিয়া তাহা হইতে সুমধুর রসাল আম্র ফল দেশে আনয়ন করেন। মূল বাল্মীকি রামায়ণ খুঁজিয়া আমরা কোথাও তাহা পাই নাই। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ; সেই বিচক্ষণতা-বলে তিনি অঞ্জনার হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন হনুমানের উপরে এই সুমহৎ কার্য্যের ভার দিয়াছেন। আম্র ফলটী ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পত্তি—এই সংস্কার যে এদেশের লোকের সহজে হইবে, তাহার আশা করা একটু দুঃসাহসের কর্ম্ম। অশ্বমেধ যজ্ঞে পিতা পুত্রের সমর মূল বাল্মীকি রামায়ণে নাই। এই ভাব গুলি কৃত্তিবাস কথক মহাশয়ের মুখে পাইয়া থাকিবেন,—তাহা তাঁহার মিষ্ট লাগিয়া থাকিবে, তাহাই স্বীয় গ্রন্থে পরম সমাদরে উহা সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে কৃত্তিবাসের সময়ে এ দেশে কথকতার প্রচার ছিল। সেও প্রায় চারি শত বৎসরের কথা। চৈতন্তের পূর্ব্ব সময়ে কথকতা প্রচার থাকিবার সম্ভাবনা। এ কথাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই বটে, অনুমানে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ তাহার পরই কীর্ত্তনাদির প্রচার সঙ্গত।

এ দেশে অনেক কীর্ত্তিমান কথক বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের নামসমূহ ধারাবাহিক ক্রমে পাইবার উপায় নাই। কেহ কখন তাহার সংগ্রহ করেন নাই। ভবিষ্যতে যে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন, তাহারও আশা অতি অল্প। কারণ আজকাল দেশের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

কথকতার মনোহারিতা ও উহার সহিত দেশীয় মানবপ্রকৃতি সংগঠনের দৃঢ়তা, ধর্ম্ম সংরক্ষণের গাঢ়তা, জাতীয়ভাব ও জাতীয় জীবন পরিচালনের ঐকান্তিকতা কিরূপ ভাবে সংমিশ্রিত আছে, তাহার প্রতি দেশীয় কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের আর তাদৃশ অনুরক্তি ও আসক্তি দেখা যায় না। বরং অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য ভাবই প্রতিনিয়ত লক্ষিত হইতেছে। দেশের খাঁটী রত্নগুলি একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। বিলাতী সমাজের বাহ্য শোভা-বিমোহিত ব্যক্তিগণের মানসিক বৃত্তিসমূহ আকৃষ্ট করিতে ইহা আর সমর্থ হইতেছে না, সুতরাং যত্ন ও উৎসাহদান অভাবে এ গুলির বিলোপ সাধন অনিবার্য্য।

আমরা পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণির নাম উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার কথকথায় সেকালের লোক বিমোহিত হইত, তাঁহার মুখে শাস্ত্রীয় কথা শুনিয়া, পুরাণের ব্যাখ্যা শুনিয়া, আপন আপন চিত্তের মালিন্য দূর করিত। তাঁহার পর কত কৃতী বিদ্বান্ ভাবুক কথক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নিবিড় অরণ্যে প্রস্ফুটিত নব মল্লিকা যেমন বিকশিত হইয়া নির্জ্জন স্থানে স্বীয় সদ্গন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক আবার অরণ্যানী মধ্যে শুকাইয়া যায়, তাঁহারাও সেইরূপ এদেশে জন্মিয়া স্বীয় উজ্জ্বল প্রতিভা প্রকাশ করিয়া দিন কয়েক জন্য দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আপন আপন নাম জাহির করিয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম ও বাসস্থান প্রভৃতির কথা আমরা কিছুই অবগত নাই।

বর্ত্তমান সময়ের সাতাশি বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে শ্রীধরের জন্ম হয়। শ্রীধর আদর্শ কথক হইয়াছিলেন। তিনি যেমন সুপুরুষ তেমনি সুকণ্ঠ ছিলেন। কবিত্বে তাঁহার তুলনা নাই।

তাঁহার সুভাবময় সঙ্গীত সকল অদ্যাপি বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টি করিয়া সৌন্দর্য্যে বৃদ্ধি করিতেছে। শ্রীধর বহরমপুর নিবাসী কথক কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের অন্তেবাসী। শ্রীধরের পিতামহ ৺ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ সুবিখ্যাত কথক ছিলেন। তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ শিরোমণি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ সুধীকুলে যে শ্রীধরের ন্যায় জ্ঞানী সুমধুরভাষী কথকচূড়ামণি জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? আমরা শ্রীধরের কথকতা শুনি নাই, কিন্তু তাঁহার গুণগরিমা অদ্যাপি তাঁহার নিষ্কলঙ্ক যশঃ শশধরের বিমল শোভা প্রকাশ করিতেছে। শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথকতা ব্যবসায়ী; উক্ত ব্যবসায়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা আছে।*

ইদানীন্তন কালে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রাম নিবাসী ৺ধরণীধর চূড়ামণি কথককুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত ৺ রামধন তর্কবাগীশ বিখ্যাত কথক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ; কিন্তু তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন না। তাঁহার রচিত পদাবলী আদর সহকারে গীত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ধরণীধর কথকতা কালে স্বীয় পিতৃব্যের রচিত পদাবলীই গান করিতেন। ধরণীধর অতীব সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। কথকতায় তাঁহার প্রগাঢ় নৈপুণ্য ছিল। রামধন তর্কবাগীশ সর্ব্ব প্রথম বিধবাবিবাহকারী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতা। তর্কবাগীশ মহাশয় স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশচন্দ্রকে সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ করিয়া কথকতা বিদ্যায় দীক্ষিত করিবেন এই মানসে একজন গীতবাদ্যনিপুণ উৎকৃষ্ট গায়ক আনয়ন করিয়া তাঁহার

* এই প্রবন্ধে শ্রীধর কথক সম্বন্ধীয় যাহা লিখিত হইল, তাহা বঙ্গবাসীপ্রকাশিত শ্রীধর কথক নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

হস্তে শিক্ষার ভার দেন। গণেশের শিক্ষার সময়ে অন্ত কেহ না শিখিতে পারে; সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ধরণীধরের সঙ্গীতে বাল্যাবধি অনুরাগ ছিল। ওস্তাদ যে সময়ে শিক্ষা দিতেন; তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে লুকায়িত থাকিয়া—তৎসমুদয় আয়ত্ত করিতেন। কালে প্রকাশ পাইল যে গণেশ অপেক্ষা ধরণী সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। তখন গুণগ্রাহী তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আর কোন আপত্তি করেন নাই, বরং তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশ করেন। ধরণী যেমন সুকণ্ঠ ছিলেন, তাদৃশ সুশ্রী বা সুপুরুষ ছিলেন না। "আকারসদৃশ প্রাজ্ঞ:" একথা তাঁহাতে খাটে না। "প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্ম বিদ্যা" এই মহাজন বাক্যের তিনিই একজন প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

যিনি ধরণীর কথকতা, তাঁহার সুমধুর গান, একবার শুনিয়াছেন, তিনি একেবারে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বের বিষয়ে কাহারও মতের পার্থক্য শুনা যায় না। সর্ব্বত্রই তাঁহার সমাদর ও সম্মান ছিল। তিনি বর্দ্ধমান মহারাজার নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তথায় এক মাস করিয়া তাঁহার কথকতা হইত। কলিকাতা আমো পোতায় প্রতি বৎসর এক মাস তাঁহার পুরাণ কথা ব্যাখ্যা হইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক অনেক স্থানে তাঁহার কথকতা শুনিয়া তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী। যখনই তাঁহার কথা শুনিয়াছি, তখনই মনোমধ্যে নূতন নূতন ভাবের অবির্ভাব হইয়াছে, যেন কোন অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ মনে হইত। সে যে কি ভাব তাহা হৃদয়ে আঁকা আছে, বাহিরে প্রকাশ করিতে পারা যায় না, লোককে বুঝান যায় না। ধরণীর কথা শুনিতে পাইয়াছি বলিয়া আত্মশ্লাঘা মনে করি। তাঁহার বক্তব্য বিষয় সমূহের বর্ণনা করিয়া

বুঝাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা; এই আশঙ্কায় এই স্থানেই মাদৃশ বেদব্যাসের বিশ্রাম।

ধরণীর পর জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি আজ কাল আবার তাহাও শুনিনা। দেশের একটী মহৎ অভাব উপস্থিত। বহুদিন আর উপযুক্ত কথকের কথা শুনি নাই। দুই এক স্থানে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে লুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া সেই মহাপুরুষের শোক উদ্দীপিত করিয়া দেয়। বস্তুতঃ ধরণীর সঙ্গে সঙ্গে কথকতা বিদ্যার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশের লোক আজ কাল চাকুরীগত প্রাণ হইয়াছে। তাহাতে দেশের অভাব ঘুচিতেছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া উদরান্নের জন্য অনেকে লালায়িত হইয়া পড়িতেছেন। ডাক্তারী বিদ্যায় আর অন্ন নাই। উকীল সম্প্রদায়ের অনেকে কিল খাইয়া কিল চুরী করিতেছেন; শামলা শিরশোভাবর্দ্ধক না হইয়া পীড়াদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে নিরুপায় হইয়া অন্ন চিন্তা চমৎকার অবস্থায় পড়িয়া পাঠশালায় ঢুকিতেছেন। দেশের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মহা অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশমান। কিন্তু পূর্ব্বে দেশীয়গণ স্বাধীন উপায়ে আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, স্বপরিবারগণকে সুখসচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতেন, গণ্য মান্য সমাজে সমাদৃত হইতেন, তাঁহারা এক্ষণে হেয়, ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছেন। দেশের দুর্গতির সীমা নাই। চাকুরী—পরপদলেহনই

আজ কাল বিশেষ গৌরব ও সম্মানকর হইয়াছে। যাঁহারা দেশের হিতানুষ্ঠানে রত, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে একান্ত যত্নশীল, তাহাতে কায়মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্ব স্ব সমাজপরিচালন ও পরিপোষণের পন্থা প্রদর্শন করেন—তাহার জন্ত উৎসাহী হন, ইহাই ঐকান্তিক কামনা।

আমরা কথকতা বিষয়ে একটি মাত্র ছায়া প্রদান করিলাম। যদি কেহ অভিজ্ঞ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মাতৃভাষায় থাকেন, তিনি দেশের মঙ্গলের জন্ত, পরিপুষ্টির জন্ত, জাতীয়তা সংরক্ষণের জন্য, ইহার আমূল বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবেন এই আশা করিয়া অবসর লইলাম। বঙ্গদেশে আজকাল কৃতবিদ্য লোকের অভাব নাই, চিন্তাশীল সুলেখক যথেষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারা অনেক নূতন বিষয় অনুশীলন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এই সামান্য বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি? তাহা হইলে অনেক নূতন তত্ত্ব ও নবীন ভাব সংযোজিত হইয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে। অনেক স্বদেশীয় মহাপুরুষের জীবনের অজ্ঞাত বিষয় মানব লোচনের পথবর্ত্তী হইয়া জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

শ্রী........... শর্ম্মা।

প্রত্যাখ্যাতা।

১

অদূরে শোভিছে গিরি হেমকূট নাম
হেমকান্তি হেমাকর শত শৃঙ্গময়।
প্রকৃতির লীলাস্থল, অপ্সরার ধাম,
ইন্দ্রের বিহার ভূমি রম্য সুখময়॥

২

অধিত্যকা উপত্যকা কত শত আর
শোভিছে অঙ্গেতে তার নয়ন-রঞ্জন।
সুন্দর উপল রাশি, হীরকের হার,
মণি মরকত কত তমস-ভঞ্জন॥

৩

নবকিসলয়যুতা, লতা, ফুল্লাধরা,
বাঁধিছে যেখানে দৃঢ় প্রণয়-বন্ধনে
বিচিত্র বিটপীশ্রেণী ফলফুল ভরা
বিচিত্র-বিহঙ্গ-গীতি-মুখরিত বনে॥

৪

তুঙ্গ শৃঙ্গ দেশ-হ'তে ক্ষীণ রৌপ্যধারা
ঝরিছে সহস্র পথে নির্ঝরের মালা।
গিরিবর পাদমূলে মিল' একাকারা
স্রোতস্বিনী ধরণীর নাশে তৃষাজ্বালা।

৫

নহে ত সুদূর ওই দেখা যায় আর
হেমকুট সানুদেশে মরীচি-আশ্রম।
দেবতা রক্ষিত বন, তপোবন সার,
দূর হ'তে চিত্র বলি' যারে হয় ভ্রম।

৬

আশ্রমের প্রান্ত ভাগে পুণ্যতোয়া যেথা
পর্ব্বত-তনয়া ওই নদী স্রোতস্বিনী,
বহি' যায় কল নাদে; কে রমণী সেথা
তটে বসি শোকাকুলা কান্তা মনস্বিনী?

৭

করেতে কপোল ন্যস্ত; মুক্তকেশ তারি
পৃষ্ঠদেশ হ'তে নামি' চুমিছে ধরণী।
নয়নে উদাস দিঠি—দুই বিন্দু বারি;
বিমলিনা আজি বামা কনক-বরণী॥

৮

যাতনার—বিষাদের সুগম্ভীর লেখা
জাগিয়ে রয়েছে পাংশু বদন মণ্ডলে।
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ; ভালে শত চিন্তারেখা;
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছুটে বক্ষতলে॥

৯

দিবা-অবসান প্রায়—ধীর পদে আসে
লাজমৌন বধূ মত শান্ত সন্ধ্যাসতী।

আঁধার-বসন-প্রান্ত উড়ে আশে পাশে,
আঁধার ঘোমটা খানি দুলে ধীরগতি ॥

১০

সন্ধ্যার আঁধার সম ওই, ঘোরতর
হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেল মন।
করেতে চাপিয়া বক্ষ বেদনা-কাতর
গভীরে উচ্ছাসি' বামা কহিল তখন—

১১

"এই যদি ছিল ভালে, নিদারুণ বিধি ;
কেন নাহি বিনাশিলে জন্মমাত্র হায় !
কেন বা শকুন কুল লজ্যি' তববিধি,
না বধি' রক্ষিল মোরে পতত্রের ছায় ?

১২

"শুনেছি প্রসব মাত্র ত্যজিয়া গহনে
জননী চলিয়া গেল ইন্দ্রের ভবন।
অজ্ঞান নির্দ্দোষ শিশু কাঁদিনু বিজনে
না জানিনু মাতৃ-স্নেহ জীবের জীবন॥"

১৩

"দৈব ক্রমে আসিলেন কণ্ব তপোধন
দেখিলেন মোরে সেই কানন-ভিতরে।
দয়া বশে আনিলেন আশ্রমে আপন
দিলেন পালনভার গৌতমীর করে॥"

১৪

"আশ্রমে পালিতা লতা কুরঙ্গীর মত
কণ্বের পালিতা কন্যা বাড়িনু আশ্রমে।
পবিত্র আশ্রম রীতি যাগ যজ্ঞ ব্রত
শিখিনু সকল (ই) সেথা বহু পরিশ্রমে॥"

১৫

"তাপসের তপোনিষ্ঠা, যোগীদের যোগ,
সংযমীর শিখিলাম সংযম সাধন।
সাধুমুখে তত্ত্বসার 'ইন্দ্রিয়ের ভোগ'
শুনিলাম 'করে মাত্র কলুষিত মন'।

১৬

"অনুসূয়া প্রিয়ম্বদা সখিদ্বয় সনে
সহবাস করি' সদা সেই বনাশ্রমে।
সরল আচার আর ব্যাভার যতনে
ঋষিকন্যা-উপযোগী শিখিলাম ক্রমে॥"

১৭

"সংসারের—সংসারীর কূট-রীতিনীতি
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ঘোর কাপট্য ছলনা।
শিখি নাই এ জীবনে; হয় নি"কুমতি
আদর্শ করিতে মোর সংসারী ললনা॥"

১৮

নিরবিল সতী; সেই কাতর উচ্ছাস
সকরুণ প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তবে

শূন্যেতে মিলায়ে গেল ; ফেলি' ঘন শ্বাস,
কহিতে লাগিল বালা পুনঃ উচ্চ স্বরে।

১৯

"কে চাহে বাঁচিতে বল সহি' প্রত্যাখ্যান ?
অহো ; কি সুতীব্র জ্বালা জ্বলিছে অন্তরে !
শারঙ্গরবের কথা বলি' উপাখ্যান
কি না দোষ দিল রাজা প্রকার অন্তরে"

২০

দেখিতে দেখিতে ক্রোধ উপজিল মনে
গর্জ্জিয়া উঠিল বালা ত্যজি' ধরাসন।
ঘৃণায় কুঞ্চিয়া নাসা আরক্ত-বদনে
কহিল অধর দন্তে করি' নিষ্পেষণ ॥

২১

"আমারে কহিলে ছি, ছি দুষ্মন্ত রাজন,
অনৃত ভাষিণী ভ্রষ্টা চপলা রমণী !
তব পরিণীতা আমি ;—তুমি হে কুজন ;
চিনে মোরে চিনিলেনা শঠ চূড়ামণি।"

২২

"দিয়েছিলে অভিজ্ঞান এক নিদর্শন
তপোবনে মিলনের তোমার আমার।
দৈববশে সে অঙ্গুরী হ'ল অদর্শন ;
অভাগিনী হারাইনু বিশ্বাস তোমার !

২৩

"গিয়েছিনু নিজে আমি তব সভাদেশে ;
কুল বধু খুলেছিনু মুখ-আবরণ।
নির্জ্জন-আলাপ-কথা মোহের আবেশে
বলেছিনু পাশরিয়া কুল-আচরণ।"

২৪

"তবু ও চিনিতে তুমি নারিলে আমায় ;
পরিচয় হ'ল মম অঙ্গুরীয় ভবে !
ধিক্ পরিচয়ে হেন কে চাহে তাহায় ?
ধিক্ চাতুরীতে তব ধিক্ প্রেমে তবে ॥"

২৫

"সরলা মুনির সুতা শকুন্তলা আমি,
প্রেম অভিনয় করি, হরি' মোর মন
'পাটরাণী' হবে বলি' করেছিলে তুমি
বনাশ্রমে মোরে রাজা বিবাহ বন্ধন ॥"

২৬

"করিয়াছ তিরস্কার 'চপলা' বলিয়ে ;
চপলা হয়েছি সেও তব বাক্য ছলে।
পিতার অবর্ত্তমানে আপনা ভুলিয়ে
তোমারি আগ্রহে মাল্য দেছি তব গলে"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল সেন।

ভাণ্ডার।

তৃতীয় বর্ষ।]　　ভাদ্র।　　[পঞ্চম সংখ্যা।

চাক্‌মাজাতির উপজীব্য।

ফসল সংগ্রহ।

বলাবাহুল্য, যাবতীয় ফসল একসঙ্গে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ লাউ, কুমড়া, শসা, বেগুণ, মার্ফা, চিনার, তরমুজ, ভুট্টা ইত্যাদি যথাক্রমে দেখা দেয়, পরে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধান পাকে। এবং কার্পাস ও তিল পাইতে প্রায় কার্ত্তিক মাস আসিয়া পড়ে। এই তাহাদের শেষ ফসল। কাপ্তান লুইন নির্দ্দেশ করিয়াছেন (ক),—এক দম্পতী বৎসরে নয় কাণি (প্রায় এগার বিঘা) জমিতে জুম করিতে পারে। এই ভূমিতে বীজের নিমিত্ত গড়ে ৬ আড়ি (খ) ধান, ৩ আড়ি কার্পাস, এবং তদনুপাতে তিল, ভুট্টা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। তদ্ভিন্ন তরিতরকারীর জন্য লাউ, কুমড়া, মার্ফা, সশা প্রভৃতির বীজ ও আবশ্যক। নিম্নে তাঁহারই নির্দ্ধারিত আয় ব্যয়ের তালিকাখানি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—

(ক) Appendix D (The Joom),—The Hill Tracts of Chittagong, and the dwellers therein.

(খ) এক আড়ির ওজন সমান চৌদ্দ সের।

"উপরি নির্দ্দিষ্ট জুম-আবাদে আনুমানিক শ্রম—মূল্য—

জঙ্গল পরিষ্করণ—	একজনের	২০ দিন—দৈনিক	মজুরী	পাঁচ	আনা	হিসাবে	৬।০
বৃহত্তম কাষ্ঠাদি স্থানান্তরিতকরণ ও সাজান	"	১০ দিন	"	"	"	"	৩৶০
দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠ দূরক্ষেপণ-দম্পতির		১০ দিন	"	"	"	"	৬।০
বীজ বপন—	"	৭ দিন	"	"	"	"	৪।৶০
ঘাস বপন (প্রথমবার)	"	২৪ দিন	"	"	"	"	১৫৲
" " (দ্বিতীয়বার)	"	১২ দিন	"	"	"	"	৭৷০
" " (তৃতীয়বার)	"	৬ দিন	"	"	"	"	৩৸০
ধান কাটা	"	৩৬ দিন	"	"	"	"	২২৷০
শস্যাদির গুঁড়ি কর্ত্তন	"	৩ দিন	"	"	"	"	১৸৶০
কার্পাস তোলা (প্রথমবার)	"	১৮ দিন	"	"	"	"	১১।০
" " (দ্বিতীয়বার)	"	২৭ দিন	"	"	"	"	১৬৸৶০
" " (তৃতীয়বার)	"	৩ দিন	"	"	"	"	১৸৶০
শস্য আছড়ান এবং কার্পাসের খোসাছাড়ান	"	১২ দিন	"	"	"	"	৭৷০
							১০৮৶০

বীজের মূল্য—৪৷০ দা প্রভৃতি—২৷০ ঝুড়ি প্রভৃতিতে ৮৲	...	...	...	...	১৫৲
		সর্ব্বমোট			১২৩৶০

"এক্ষণে দেখা যাউক উল্লিখিত ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের মূল্যপরিমাণ কি হইতে পারে।—

ধান্য—১২০ আড়ি, টাকায় ৫ আড়ি হিসাবে ... ৩৬৲

কার্পাস ১২৲মণ, মণপ্রতি মূল্য তিন টাকা ... ৩৬৲

তিল ও তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য	...	৪৲
		৭৬৲
এতদ্ব্যতীত বাঁশকাটা, নৌকা গঠন প্রভৃতির দ্বারা অতিরিক্ত উপার্জ্জন যেন	...	৩০৲
সর্ব্বমোট	...	১০৬৲

"কিন্তু এক দম্পতির বৎসরের নৈমিত্তিক খরচ যথা—

ধান্য ১২০ আড়ি	মূল্য	৩০৲
মৎস্য	"	৪৲
তৈল	"	১৲
লবণ মরিচ প্রভৃতি	"	৬৲
সুপারি তামাক প্রভৃতি	"	১০৲
কাপড়	"	১২৲
পূজা প্রভৃতি	"	৮৲
উৎসবাদিতে	"	৬৲
চিকিৎসা ব্যয়	"	৭৲
অলঙ্কার বিবাহিতে ব্যয় ?	"	১৫৲
জুমের দা প্রভৃতিতে	"	২॥০
বীজ"	"	৪॥০
মোট		১০৬৲

সুতরাং দেখা যাইতেছে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তৎসমস্তই অতি আবশ্যকীয় খরচ সমূহে শূন্য হয় (ক)।

(ক) যদিও বর্ত্তমানে ধান্য-কার্পাসাদি মহার্ঘ্য হইয়াছে, মজুরের বেতন তদনুপাতে আরও অধিক।

জুমিয়ার অভাব।

তদ্ভিন্ন জুমকর ও অপরাপর অপরিহার্য্য কার্য্যের নিমিত্ত ইহাদিগকে হয়তঃ এ সকলকে সংক্ষেপ করিতে হয়, নতুবা ঋণ নিশ্চিত। আমি রাজপুরুষের উপরোক্ত তালিকার কোন পরিবর্ত্তন করি নাই। অথচ তিনি যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ইহাদিগের পারিবারিক অসাচ্ছন্দ্য সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। অধিকন্তু ইতিমধ্যে ইহাদিগের উপর কয়েকটী নূতন কর চাপান হইয়াছে, এবং কালের কুটিল গতিতে সাংসারিক খরচের মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই তালিকানির্দ্দিষ্টপথে পরিবার পরিচালনও কত দুরূহ, ভুক্তভোগীমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অনেককেই তাদৃশ দুঃসময়ে অনশনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। তাই সামান্য অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষরাক্ষসী করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া ইহাদিগের বক্ষোপরি নৃত্য করিতে থাকে।

হল।

পূর্ব্বে এদেশে হল চালনার প্রচলন ছিল না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দেও কাপ্তেন লুইন বলিয়াছেন (ক), "হল কর্ষণ দ্বারা কৃষি করে, এমন একজন পাহাড়ীকেও আমি জানি না। বাস্তবিক জুম ব্যতীত অন্যবিধ উপায়ে জীবিকার্জ্জন কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় সম্পন্ন ব্যক্তির বাস সমীপবর্ত্তী সামান্য ভূমিখণ্ড মাত্র কোন কোন সময়ে হলকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা তজ্জন্য বাঙ্গালী চাকর নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি "বন-সংরক্ষণী (Forest Reserve) বিধি" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আশা করা যায়, অতঃপর তাহারা (জুমের ক্ষেত্রাভাবে] লাঙ্গলের চাষ

ক The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein —P. 13-14.

অবলম্বন করিবে।" পরন্তু তাঁহারই তিন বৎসর পরবর্ত্তী মত (ক)—"চাক্‌মাদিগের মধ্যে এমন এক শক্তি জন্মিতেছে যে, তাহাদের হেডম্যানদের হইতে স্বকীয় স্বার্থ প্রথমে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সুবিধানুরূপ বন্দোবস্তের দ্বারা এই জাতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পাঁচ বৎসরের মধ্যে কৃষক হইতে পারিবে।"

চাষের সাহায্য।

তদীয় ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সহৃদয়তা এবং স্বর্গগত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং নীলচন্দ্র দেওয়ান মহোদয় দ্বয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে এদেশে লাঙ্গলের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়; অধুনা তাহা বিস্তারিত প্রায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন এসম্বন্ধে সাধারণের আপত্তি উঠে, সরকার বাহাদুর অতি ধীরভাবে অবিচার মীমাংসা করিয়াছেন (খ)। তাহা ছাড়া, ১৮৯২ সালের আইন প্রণয়ন কালে ও ইহার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। প্রথম তিনবৎসর সম্পূর্ণ নিষ্কর ভোগদখল করা যায়। অনন্তর যে কর নির্দ্দিষ্ট হয়, দশবৎসর যাবৎ তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকে। রাজা এই প্রাপ্তকরের ষোড়শাংশ মাত্র পাইলে, হেডম্যান অর্থাৎ গ্রামের মোড়ল অষ্টমাংস পাইবার ব্যবস্থা আছে। ইহার কারণ ও উল্লিখিত আছে, হেডম্যানগণ তাহা হইলে লাঙ্গলের চাষবিস্তারে অধিকতর চেষ্টাপর হইবেন—এই বিধিমতে চাষকরের প্রাপ্ত টাকা প্রতি হেডম্যান তিন আনা এবং রাজা বাহাদুরের ভাগে দুই আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ

ক Letter No. 532—To the commissioner of Chittagong dated 1st July 1872.

খ See the offs. secretary of Bengal—Mr. A. P. Macdonall's letter No. 1985-797 L. R. dated 1-9-1881.

চাষের প্রতি মাননীয় গভর্ণমেন্টের পূর্ব্বাপর সহানুভূতি রহিয়াছে। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরকে খেলাত প্রদান কালে ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর সারজন উডবরণ ও বলিয়াছিলেন (ক)—"It attaches great importance, as you are aware, to the abandonment of their nomadic habits by the hillnea, and their adoption of plough cultivation wherever land is available. "অর্থাৎ" ইহা আপনার জানা আছে যে গভর্ণমেণ্ট, পার্ব্বতীয়দিগের ভ্রমণশীল অভ্যাস পরিহার করাইয়া, যেখানে স্থল পাওয়া যায়, তথায় লাঙ্গলের চাষ অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

চাষের বিস্তার।

বড়ই সুখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষের এতাদৃশী চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। অধুনা চাক্‌মাদিগের অনেকেরই চাষের প্রতি মতিগতি ফিরিয়াছে। উপযুক্ত মূলধন সংগৃহীত হইলে ইহারা স্বতঃই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। ফেণী ও চেঙ্গীনদীর তীরবর্ত্তী সমতল ভূমি সমূহে একমাত্র হল চালনাতে আবাদ চলিতেছে। ঐদিকের জমিগুলিতে উৎপাদিকা শক্তিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে এই চাষবিস্তারের ফলে—ইহারা যে পুর্ব্বে নিয়ত বসতি স্থানান্তরিত করিত, তাহা বন্ধ হইয়াছে। এক্ষণে অনেকেই স্থায়ী বাড়ীঘর প্রস্তুত করিতেছে।

বাঙ্গালী সহায়তা।

কিন্তু ইহাদিগের ভিতর এই চাষ বিস্তারের মূলে বাঙ্গালীদিগের সাহচর্য্য ও কম উল্লেখযোগ্য নহে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন এই পার্ব্বত্য

ক "Statesman"—dated 16th December, 1898

চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের নিকট যে (নম্বর—৪৭২) পত্র দেন, তাহাতে উল্লিখিত ছিল, "এই জিলায় ত্রিবিধ প্রথায় ভূমির চাষ হয়। (১) কেবল মাত্র বাঙ্গালীদিগের চাষ, (২) বাঙ্গালী ও চাক্‌মাদিগের সম্মিলনে চাষ (রাঙ্গামাটি ও নীলচন্দ্র দেওয়ানের গ্রামে), এবং (৩) পাহাড়িগণ দ্বারা কর্ষণ।" পরবর্ত্তী কমিশনার মিঃ বিম্‌স্ ও বাঙ্গালী সংসর্গ জনিত এই উপকারের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন (ক)। তবে আক্ষেপের কথা এই যে, এত বৎসরের সহায়তা লাভ করিয়া ও, চাক্‌মাদিগের অধিকাংশ এ যাবৎ সম্পূর্ণ অনন্ত-নির্ভরভাবে লাঙ্গলের কাজ চালাইতে পারেনা। বাঙ্গালী ভৃত্য রাখা অনেকেরই আবশ্যক হইয়া পড়ে। শুনিতেছি, "রাজবিলাস মডেল ফারমে" রাজা বাহাদুরের কোনও লাভ নাই, উপরন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাহার কারণ, একেত পরনির্ভরতা, তাহাতে আবার বিজাতীয় বিদেশীয় চাকর, তাহাদের তত সহানুভূতি থাকিবে কেন? যাহা হউক, তথাপি যে তিনি নিজে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও প্রজা সাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি যথার্থ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র!

আউক, তামাক ও সরিষার চাষ।

এইত গেল ধানচাষের কথা, আউকের চাষ ও সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে সাতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সুবিধাও মন্দ নহে। একবার বপন করিলে তিন বৎসর ধরিয়া তাহারই ফসল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহারা এহেন সুবিধার কথা অবগত ছিলনা। কয়েক বৎসর হইল, অত্রত্য বাঙ্গালী আফিসার (Officer) বাবুরা যৌথমূলধনে রাঙ্গামাটির পার্শ্ববর্ত্তী মাঠে বিরাট আয়োজনে ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু

---

* See the letter No. 5 dated22-9-1879.

পরিচালকের ত্রুটিতে তাহা অকালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক তদ্দ্বারা যে এই পার্ব্বত্য জাতির ইক্ষুচাষের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তদ্ভিন্ন ইহারা শীতকাল আসিলে শুষ্ক নদীসৈকতে তাম্রকূট বীজ বপন করে। ইহাতে বিশেষ কোন পরিশ্রম নাই, তেমন শক্ত বেড়া ও দিতে হয় না। কেবলমাত্র কষ্ট এই যে, বৃন্তমূল দিয়া যে সমুদয় নবমুকুল বাহির হয়, প্রত্যহ তৎসমস্ত ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা পত্রগুলি সতেজ হইতে পারেনা। আর হলকৃষ্ট ভূমিতে সরিষা ও ছড়ায়। শীতাগমে ফুল সব বিকসিত হইলে ক্ষেত্রের হরিদ্রাভায় দূর হইতে দর্শকের নয়ন প্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যায়!

বৈজ্ঞানিক চাষ।

"রাজ বিলাস মডেল ফারমে" নব প্রচলিত বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয় না। কিন্তু কুমার রমণী বাবু স্বীয় "আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে" এনিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি চট্টগ্রাম "বিভাগীয় কৃষি সমিতির" অন্যতম সভ্য। সুতরাং তাহাতে ও সাহায্য পাইতেছেন। তা'ছাড়া কৃষি সম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তিকা এবং মাসিক পত্র অবলম্বনে তাঁহার যাদৃশী চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে আশা হইতেছে—"আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" কালে নিশ্চিতই সফলতা প্রদান করিবে। সব্‌ডেপুটি বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও কৃষি বিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তদীয় রাঙ্গামাটি বাসার অনতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বৎসর বৎসর শাকসব্জীর চাষ করিয়া থাকেন। মৃত্তিকার অনুর্ব্বরতা নিবন্ধন তাঁহার বহু চেষ্টাতে ও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বাবু কৃষ্ণকিশোর দেওয়ান একবার তাঁহার বাড়ীতে আলুর চাষ করিয়াছিলেন। তদুৎপাদিত এক একটা আলু ওজনে প্রায় একপোয়া পাঁচছটাক হইবে। কিন্তু আস্বাদে নৈনীতালের আলুর মতন নহে। তথাপি ইহাতে

তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে। এজন্য তিনি অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র! 'কাঁচালঙের মুখ' নিবাসী বাবু ইন্দ্রজয় দেওয়ানের নাম এস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি বিগত প্রদর্শনীতে সকলকে দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছেন যে, এই পার্ব্বত্য মৃত্তিকাগর্ভে কি বহুমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে! প্রধানতঃ উৎপন্ন কলা, মুলা, সালগম, বেগুন, কুমড়া ও কচু সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বীয় অসামান্য অধ্যবসায় এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দেপ্রমুখ কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠ কৃষিবিদ্‌গণের প্রচারিত গ্রন্থ সাহায্যে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় প্রদর্শনীর উচ্চতম পুরস্কারও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। যদি সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট এজন্য তদীয় পোষকতা করেন, তবে তিনি আরও উন্নতি করিতে পারিবেন—আশা করা যায়!

উৎপন্নদ্রব্য*।

ধান্য—নানা জাতীয়। তন্মধ্যে আবার প্রত্যেক জাতি কতিপয় শ্রেণীতে বিভাজিত। যথা,—বিনি দ্বাদশ প্রকার। "কবা বিনি," "বাঁদরা" বা "নুখ বিনি," শূকরের "লৌবিনি," "পেরেৎছা বিনি" "কোৎছা বিনি," অথবা "লবা বিনি," "থোবা বিনি", "উত্তয়োবিনি", "রাঙা বিনি," "কুড়িবিনি," "লক্কা বিনি," "থেবি বিনি," "লক্কাপোড়া বিনি" ইত্যাদি, "তুর্মি"—দুই প্রকার, সাদা ও কাল। "বাডৈয়া" ত্রিবিধ—"বড় বাডৈয়া" "ছোট বাডৈয়া" এবং "চিকণ বাডৈয়া"। "কাত্রং" ও তিন জাতীয়—বড়, ছোট ও চিকণ। "ছুরী" দ্বিবিধ—"জৈট্‌ ছুরী" এবং "এমিছুরী"! এইগুলি প্রায় ভাদ্রের শেষভাগে পাকে। আর সকলের মধ্যে "মেইলি" দুইপ্রকার—

---

* আমরা এস্থলে অসুবিধায় পড়িয়া কোটেশন চিহ্ন অনেকেরই চাক্‌মানাম দিতে বাধ্য হইলাম।

"মেইলি" ও "রঙ্গী"; কবোরক ষড়বিধ—"কলা," "রাঙা," "ধোবি," "হৈইল" লুম্ব্র ও "পেলাং"। এই সমুদয় এবং "গেইলং" প্রভৃতি শ্রাবণের শেষে কি ভাদ্রের প্রথমেই পরিপক্ক হয়। এতদ্ভিন্ন "টার্থো," "পর্তকি" ও মধুমালতী প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে. আশ্বিন মাসে পাকিয়া যায়; এবং "কামাইন ধান" ভাদ্র মাসের মধ্যেই পাকে।

ভুট্টা—স্থানীয় নাম মোক্কা, ইহা চারিজাতীয়। যথা, "বিনি মোক্কা," "চিত্র মোক্কা," "লাল মোক্কা" এবং "ধোপ মোক্কা"। এগুলিও ভাদ্রমাসের মধ্যে পাকিয়া যায়।

তিল—দুই প্রকার, সাদা ও কাল। কিন্তু সরিষার কোনও প্রকার ভেদ নাই।

কার্পাস*—দ্বিবিধ; "ফুল সূতা" ও "বিনিসূতা"। ফুলসূতা ধবল বর্ণ ও উৎকৃষ্ট। জুমে প্রধানত ইহারই চাষ হয়। "বিনিসূতা" ধূসর বর্ণ—কেহ ইচ্ছা করিয়া ইহার বীজ বপন করে না। ফুলের বীজের সহিত ইহার বীজ মিশ্রিত হইলে সামান্য পরিমাণ দেখা যায়।

আলু।—"মই (লাল) আলু", "বাঁশতারা আলু", "হিমি আলু", "রেং আলু" এবং "লাল ফেইলা আলু" "সাদা ফেইলা আলু" ইত্যাদি।

কচু।— ওলকচু (ওজনে প্রায় ১॥• মণের ও অধিক হয়), মান কচু, চাক্‌মা কচু, "কুলপা কচু", "বিনি কচু," "শুকনা কচু", "কুসুমী কচু", "নদি কচু", "ছা-কচু", প্রভৃতি স্থলজাত; এবং "কালগোয়ারী কচু", "সাদাগোয়ারী কচু", "হেরা কচু," "মোদম কচু", প্রভৃতি জলজ ইত্যাদি।

---

* কার্পাস এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় বটে কিন্তু এ সকল কার্পাস অতি নিকৃষ্ট। কাপড়ের সূতার পক্ষে এ সমুদয় সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইহার অধিকাংশ পশমের সহিত মিশাল দিবার নিমিত্ত জর্ম্মানিতে রপ্তানী হয়।

তরিতরকারী।— বেগুণ দ্বিবিধ—"বারমাস্তা বেগুণ" ও "জৈট বেগুণ"। এতদ্ভিন্ন "মার্‌ফা", "চিনার", সশা, "কুদুগুলা"* (লাউ), "ছুঁয়ুরীগুলা" (কুমুর), ঢেরস, ঝিঙা, "তিতাগুলা" (উচ্ছে), "কৈদা", "ছিম"; শাকের মধ্যে "পুঁই শাক," "ছাব্রেং শাক," "ফুছিশাক," "আজাম শাক," "মারেস (নটে) শাক," "নারিচ্‌ শাক," "গাংকুল্যা শাক," "ইয়ারং শাক," কচুশাক, ঢেঁকি শাক এবং "লেংরা শাক" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন—

লঙ্কা ও নানা জাতীয় আছে; এবং "বাইবাহর," "জুম্যোবহর" প্রভৃতি ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে।

———

শিল্প।

শিল্প রচনায় চাক্‌মা জাতি পশ্চাৎপদ নহে। বরং, তন্নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে একটি উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে আমাদের রমণী সমাজ নিদ্রালসে কাল অতিবাহিত করে, চাক্‌মাগৃহিণী সেই সময়ে সাংসারিক অভাব পূরণে নিরত থাকে। দিনের বেলায় তাহাদের অবসর মাত্রই নাই। যদি গৃহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অবকাশলাভ হয় তখন তাঁত-খানি হইলেও লইয়া বসে। রাত্রিরও অধিকাংশ ধরিয়া সূতা কাটা ও সূতার বীজ ছাড়াইতে ব্যস্ত থাকে। ইহাদিগের এতাদৃশ অশ্রান্ত কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে, দয়া ও ভক্তি যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া তোলে। আমরা এই পাহাড়ী জীবনের আলোচনা কালে তৎপ্রতি বঙ্গীয় পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা আছে, ইহাদের হইতে তাঁহারা গৃহিণীপণার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

* ইহারা যাবতীয় ফল অর্থেই 'গুলা' শব্দ ব্যবহার করে।

শিল্পী-পরিমাপ।

বর্ত্তমান সভ্যতার সংজ্ঞামতে যে জাতির যত অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভর, তাহাদের সভ্যতা-গৌরবও তত বেশী! ইহাই মাত্র সভ্যতার পরিমাপক হইলে, চাক্‌মাদিগকে অসভ্য বলিয়া ভ্রূকুঞ্চন কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাদের মধ্যে সূত্রধর, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ইত্যাদিরূপে শ্রমবিভাগের দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক নাই। সুতরাং বংশমর্য্যাদানির্ব্বিশেষে সকলেই শিল্পোন্নতি সাধনে সুবিধা পাইয়া থাকে। এমন কি, ধনী-নির্ধনের মধ্যেও কোন তারতম্য দেখা যায় না। ইহাও একটী গৌরবের কারণ বটে যে, চাক্‌মাগণ কর্ত্তব্য সাধনকালে স্বকীয় পদ গৌরব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার অপরিসরতানিবন্ধন ইহাদিগের শিল্প সাধনায় এযাবৎ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা অতি সামান্য পরিমাণেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

শিল্পে সাহায্য।

এই পাহাড়ীদিগের কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকল্পে—অত্রত্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ হাচিন্সানের উদ্যোগপরায়ণতায় দুই বৎসর ধরিয়া "প্রদর্শনী" হইয়া আসিতেছে *। মাননীয় গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বার্ষিক ২০০ ্ দুই শত টাকা করিয়া দিয়া যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিতেছেন। ইহাতে স্থানীয় রাজন্যবর্গও অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। রাঙ্গামাটীতে এই "প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দুই দিন যাবৎ স্থায়ী থাকে। এ উপলক্ষে যাত্রা, সার্কাস, নৌকাচালন, দাড়ি টানা, (Tug of war) দৌড় প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেরও অভাব হয় না। বলা বাহুল্য, পাহাড়ীরা আহাদের

* The Industrial and Agricultural Exhibition. পরন্তু দুই বৎসর এযাবৎ দুর্ভিক্ষ-উৎপীড়নে স্থগিত রাখা হইয়াছে।

প্রদর্শিত দ্রব্যের নিমিত্ত যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। ইতি-মধ্যে তাহাদের প্রতিযোগিতা যাদৃশ শক্তিশালী হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, "প্রদর্শনীর" উদ্দেশ্য শীঘ্রই সুফলপ্রসূ হইবে। এই পুরস্কৃত লোকদিগের অধিকাংশই চাক্‌মাজাতীয়। গুণসাপেক্ষ বিচার হওয়াতে ইহারাই সমধিক লাভবান্ হইতেছে। তদ্বারা ও অবশ্য বুঝিতে পারা যায়, যে অত্রত্য পাহাড়ী দিগের মধ্যে চাক্‌মাগণই কৃষি ও শিল্পে উন্নত।

বস্ত্রশিল্প।

প্রদর্শিত দ্রব্যসকলের মধ্যে ইহাদের বস্ত্রশিল্পই সাতিশয় উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ভারতবাসীর ইহা লইয়া ধীরভাবে চিন্তা করা উচিত। আবার কি প্রতি গৃহে চরকা চলিবে? ভারতের সেই প্রাচীন ঐশ্বর্য্য আবার ফিরিবে কি না, কে বলিবে! আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করা কর্ত্তব্য—"আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ

কলের বসন বিনা কিসে রাখবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল, টেনা, ডোর-কপীন।

শিল্পিশাসন।

ধন্য চাক্‌মামহিলা, তাহারা লজ্জানিবারণের নিমিত্ত আমাদের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না। শুনিয়াছি, প্রথম বক্ষে জড়াইবার বস্ত্র (খাদী) খানি প্রত্যেকের নিজকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কথাটা সত্য হইলে, তাহাকে শিল্পশিক্ষার এক মনোরম শাসন বলিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক চাক্‌মামহিলাই বস্ত্রবয়নে ন্যূনাধিক পারদর্শিনী।

উন্নতি।

ইহাদিগের [হাতের] তাঁতে বস্ত্রবয়ন একটু সময়সাপেক্ষ সত্য কিন্তু তাহাতে এমনি ফুল তোলা যায় যে, দেখিতে স্বতঃই প্রশংসা করিতে ইচ্ছা জন্মে! এই সকল তাঁতে মোটা সূতার কাজই ভাল চলে। পরন্তু ইহারা রেশমী বস্ত্রশিল্পেও সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতেছে। স্বর্গীয়া চাক্‌মারাণী দয়াময়ীর স্বহস্তনির্ম্মিত দুইখণ্ড রেশমী বস্ত্র বিগত ১৩১১ সনের "বোম্বাই প্রদর্শনীতে তসরের কারুকার্য্যে বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই বস্ত্রখণ্ডদ্বয় তথাকথিত প্রদর্শনীর উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছিল না, পার্ব্বতীয় রমণীগণ এইরূপ কারুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হইবে কিনা জানিবার নিমিত্তই তাঁহার পূর্ব্বনির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ডদ্বয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে" (ক) প্রেরিত হয়, তাহারাই বোম্বাই প্রদর্শনীতে পাঠাইযাছিলেন। "ভারতী"র সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী ১৩১১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য রাজ্যের রাণীর স্বহস্তে প্রস্তুত দুইটী অতি সুন্দর বস্ত্রখণ্ড বঙ্গদেশের গৌরবের কারণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' সুবর্ণ মেডেল পাইয়াছেন (খ)। ইহাতেই তদীয়

(ক) শুনাযায়, বর্ত্তমানে "লক্ষীভণ্ডারের" নাকি অবস্থান্তর ঘটিয়াছে।

(খ) পরন্তু আমি কোন কারণে রাজাবাহাদুরের নিকট এই পদকের প্রতিকৃতি চাহিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের" কার্য্যাধ্যক্ষের কাছে বারবার লিখিয়াও পদক সম্বন্ধীয় কোন কথা জানিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। অনন্তর আমি এই প্রতিকৃতি পাইতে "লক্ষ্মীভাণ্ডারের" তদানীন্তন স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী সরলা দেবীর কাছে লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তাঁহার সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ আমাকে লিখিয়াছিলেন।—

শিল্পনৈপুণ্যের গৌরব উপলব্ধি হয়। অপর সকলের মধ্যে 'কাচালঙের মুখ' নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান এবং তদীয় শ্বশুর 'চেঙ্গী' তীরবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের পরিবারেই অপেক্ষাকৃত পটুতা দেখা যায়। সম্প্রতি শেষোক্ত মহোদয়ের অন্যতম জামাতা 'চেঙ্গীতীর বাসী বাবু শশিমোহন দেওয়ান একখানি "ফ্লাইসাটেল লুম" আনিয়া স্বীয় বাস ভবনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাজ কিরূপ চলিতেছে, এ যাবৎ সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই।/ তবে ইহাদের হাত যখন একরূপ অভ্যস্ত আছে, তখন সফলতা লাভে বড় যে বিলম্ব হইবে, বোধ হয় না। ইহারা সরু সূতা কাটিতে জানেনা, সুতরাং অধিকাংশ কাপড়ের নিমিত্ত বিদেশ জাত সূতা আমদানী হইয়া থাকে। এসকল সূতা সাদাই প্রায় আসে, অনন্তর ইহারা প্রয়োজনমতে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষবল্লীনির্য্যাস দ্বারা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়। সচরাচর "কালাসার" বৃক্ষের বল্কল জলে সিদ্ধ করিয়া নীলকৃষ্ণ (Blue Black) রঙ এবং লোহিতের নিমিত্ত "রঙ্" গাছের চূর্ণ ক্ষারের জলে মিশাইয়া লওয়া হইয়া থাকে।

ইহাদিগের নির্ম্মিত সাধারণ বস্ত্রশিল্পগুলির নিম্নে পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। যথা—

'বোম্বাই প্রদর্শনীতে' চাক্‌মারাণীর এবং ত্রিপুরার রাণীর শিল্পকার্য্য এক আলমারীতে ছিল। প্রথমতঃ আমরা শুনিতে পাই যে চাক্‌মা রাণীই সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরে যখন পদক ও তৎসঙ্গে সার্টিফিকেট আসিল, তখন দেখা গেল যে পদক ত্রিপুরার রাণীর নামে আসিয়াছে। পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর মতে চাক্‌মারাণীর কার্য্যই সুন্দর এবং পাওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং তাঁহারা এরূপই আশা করিয়াছিলেন। কিন্ত চাক্‌মারাণী আদৌ কোন পদক পান নাই।" ইহাতে বুঝাযায়, চাক্‌মারাণীর প্রাপ্তব্য পদক ত্রিপুরারাণীর নামে হইয়াগিয়াছে।

পিধন—স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র। ইহা লম্বে তিন হাত, প্রস্থে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত হইবে। বর্ণ গাঢ় নীল, মধ্যে প্রায় চারি অঙ্গুলি ধরিয়া বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুই সুদীর্ঘ ডোরা থাকে। ইহা প্রধানতঃ মোটা সূতাতেই প্রস্তুত।

"খাদী"—ও রমণীপরিচ্ছদ, তবে ইহা বক্ষ বন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘে আড়াই কি তিন হাত, কিন্তু প্রস্থে এক ফুটের অনধিক। "খাদী" দুই জাতীয়—"রাঙ্গা খাদী" ও "ফুল খাদী। "রাঙ্গা খাদী"তে লাল সূতার কাজই বেশী, "ফুল খাদী"তে ফুল রচনাতেই অধিকতর মনোযোগ থাকে। ইহাতে "বাদই চোখ," "ত্রিপুরাউলু ফুল," "করঙা ফুল" প্রভৃতি নানা রকমের ফুল তোলা হয়।

খবং—অর্থ পাগড়ী, এই শব্দটা খাশিজ, 'গম্বং' শব্দ হইতে গৃহীত বোধ হয়। ইহার সূতা সাদা, তবে যুবতীদের "খবং" প্রান্তে লোহিত বর্ণ রঞ্জিত সূতায় 'ফুল' তুলিয়া থাকে, দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাতেরও অধিক, প্রস্থ কোনরূপে একহাত মাত্র হইতে পারে।

"কর্জাল"—'ব্যাগ' (Bag) বা থলি বিশেষ। ইহা স্কন্ধোপরি হইতে উপবীত প্রায় ঝুলাইয়া লয়।

"পানের থল্যা"—ইহাকেও থলিবিশেষবলা যায়। পান-সুপারি প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"গামছা খানি"—সচরাচর গা-মুছিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেও অনেক পল্লীবন্ধুঃখী পরিধানও করিয়া থাকে। ইহা নানা বর্ণের হয়। দীর্ঘ ৩ কি ৩½ হাত এবং প্রস্থ ১ কি ১½ হাত। কোন কোন "গামছা খানি"তে ফুলও তোলা হয়।

"তৈইলা"—ইংরাজী (Towel) 'তোয়েল' শব্দের অপভ্রংশ। ইহা যে অনুকরণে আসিয়াছে, সহজেই ধরা যায়। এখনও সকলে এমনকি

অধিকাংশ স্ত্রীলোকে প্রস্তুত করিতে জানে না। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান ও শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের বাড়ীতে যে তোয়ালে প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় বিলাতী 'তোয়ালের'ই অনুরূপ। সম্ভবতঃ সর্ব্বাদৌ তাঁহাদের পরিবারেই এই অনুকরণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

"আলাম"—ইংরাজী আখ্যায় যেমন (Chart) 'চার্ট'। ইহাতে হরেক রকমের ফুল লতাদির নমুনা রক্ষিত হয়। বস্ত্র বয়নকালে আদর্শরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"বার্গ"—ইহা "পিলা" নামেও প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ বর্ণ ধবল। দুই দীর্ঘধারে লোহিতবর্ণের সামান্যরূপ পাইর। দৈর্ঘ্যে ১০ হাত ও প্রস্থে দুই হাতের দুইখানি কাপড় তৈয়ার করিয়া, উভয় খানিকে যোড়াইয়া চারিহস্ত পরিমিত বিস্তৃত করে। অনন্তর তাহাকে দুইভাঁজ অর্থাৎ ৫ হাতে × ৪ হাতে করিয়া শীতের সময় গায়ে দেয়।

এতদ্ভিন্ন চাকমা রমণীর প্রস্তুত "হিলুম" (কুর্ত্তা") এর কাপড়, বালিশের কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিলের চাদর, বিশেষতঃ দাবা-পাশা প্রভৃতি 'খেলার ঘরে' সাতিশয় কারুকার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বয়ন প্রণালী যথা :—তাঁত অপেক্ষাকৃত ছোট। স্ত্রীলোকদের দ্বারাই পরিচালিত হয় বলিয়া প্রস্থে কোনরূপে দুই হস্তের অধিক নহে। কারণ, ইহাতেও তাহাদিগকে হেলিয়া দুলিয়া মাকু চালাইতে হয়। তাঁত ঝুলাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোনও ঘর নাই। সচরাচর "ইজর" (গৃহ প্রাঙ্গণ) এ বসিয়াই বস্ত্র বয়ন করিতে দেখা যায়। জুমের ধান্যকালে জুমিয়া মহিলাগণ তাঁতের কাজে হাত দিতে পারেনা। পরে অবসর মতে অর্থাৎ সাংসারিক নৈমিত্তিক কার্য্যাদি সারিয়া—যে সময়ে আমাদের বঙ্গমহিলাগণ নিদ্রা-সুখ-সম্ভোগে কাটায়, তখন ইহারা তাঁত খাদি লইয়া বসে। এইরূপে "পিঁধনের" মত একখানি কাপড় তৈয়ার করিতে প্রায় মাসাধিক কাল গত

হয়। কিন্তু কাপড়ও এরূপ টেঁকসই হয় যে, দুই খানি "পিঁধনে" অবাধে দুই বৎসর কাটিয়া যায়।

টানাগুলির উভয় প্রান্ত দৃঢ় সন্নিবদ্ধ থাকে। একপ্রান্ত "তাম্ব্যো বাঁশে" (ক) আবদ্ধ করিয়া, বাঁশের উভয়দিক্ সম্মুখস্থিত কোনও স্তম্ভে বাঁধিয়া দেয়। অপর প্রান্ত "তাগলক্ যোড়ে" (খ) আটকাইয়া দু'পাশে দুইখণ্ড রজ্জু মহিষচর্ম্মের "তাব্‌ছি" সহযোগে কটিদেশে টানাইয়া লয়। কর্কশ-রজ্জুতে মেরুদণ্ডে ব্যথা লাগে, তাই এ চর্ম্মে "তাব্‌ছির" প্রয়োজন। টানাগুলির কতক উপরে ও কতক নিম্নে থাকে, সেই ঊর্দ্ধাধঃ অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে "ব-কাঠি" (গ) ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কৌশলের সহিত সামান্য জোরে নাড়া দিলেই উপরের টানা নীচে এবং নীচের টানা উপরে চলিয়া আইসে। এতদ্ভিন্ন, কাপড়ে যত অধিক ফুল তুলিতে হয়, "ব-কাঠি" ও তত অধিক প্রয়োজন।

ফুল বা লতার প্রত্যেক রূপান্তরে এক একখানি "ব-কাঠির আবশ্যক হইয়া থাকে। এই "ব-কাঠি"র সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড "ছুচ্যাক্ বাঁশ" (ঘ) ও থাকে; তদ্দ্বারা "ব-কাঠি" চাপিবার সুবিধা হয়। টানাগুলি যাহাতে ইতস্ততঃ সরিতে না পারে, তাই তৎসমুদায় "স্থয়ং" নামধেয় সরুবংশ দণ্ডে সুকৌশলে জড়িত থাকে। এইরূপে টানা সজ্জিত হইলে "থুর্ চুঙায় (ঙ)

(ক) "তাম্ব্যোবাঁশ"—ইহা সাধারণ বংশখণ্ড মাত্র।

(খ) "তাগলক্ যোড়"—বাঁশের দুইখানি বাখারিমাত্র।

(গ) "ব-কাঠি"।—ব অর্থাৎ সূত্র—কাঠি। সচরাচর এই "কাঠি"তে টানাগুলি একান্তরে জড়া ইতে হয়, তবে ফুল-লতাদি তুলিতে "আলাম" দেখিয়া টানা জড়াইয়া থাকে।

(ঘ) "ছুচ্যাক্ বাঁশ"।—ইহা প্রায় "তাম্ব্যোবাঁশ" এরই অনুরূপ; বিশেষত্ব এই যে, উহার একপ্রান্ত সূচাল।

(ঙ) "থুরচুঙা"—বংশনির্ম্মিত যন্ত্র। ইহা একটি একপ্রান্ত বদ্ধ সাধারণ চুঙা

পড়েন চালাইয়া "ব্যং" (গ) দ্বারা তাহা চাপিয়া দেয়। একটি 'পড়েন' ফিরাইতে—প্রথমতঃ "ব্যং" দ্বারা পূর্ব্ববিন্যস্ত পড়েন চাপিয়া "ছুঁচ্যাক্ বাঁশের" সাহায্যে (গ) "ব-কাঠি"র উপরের টানাগুলি নীচে এবং নীচের গুলিকে উপরে তুলিয়া লয়; এবং "ব্যং" খানি সেই উন্মুক্ত পথে চালাইয়া পুনরায় চাপ দ্বারা পড়েনের স্থান অব্যাহত করে। অনন্তর "থুর্‌চুঙ" বিপরীতাভিমুখে চালাইলেই পড়েন পড়িয়া যায়, যদি কোনরূপে টানা বা পড়েন সঙ্কুচিত বা জটিল বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সজারুকণ্টকের সাহায্যে তাহার শৃঙ্খলাবিধান করা হয়। এই কাঁটার সাধারণ নাম—"কুচুক্কাচুক।

বস্ত্রবয়নের প্রধান কার্য্য—টানা এবং "ব-কাঠি" ঠিক করিয়া লওয়া। তাঁহাদের "ব্যং" চাপন ও "থুর্‌চুঙা" চালনে কোনও বিশেষ পারদর্শিতা নাই। পরন্তু একবার 'পড়েন' ফিরাইতেই ইহাদের প্রায় ৩।৪ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, 'টানা' বসাইবার পূর্ব্বে সূতাগুলি কলপে মাখিয়া লয়, অন্নমণ্ডই ইহাদিগের একমাত্র কলপ। এইরূপে—

"কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী,
সুবর্ণ অঙ্গুলি চয়
—কিন্তু কোমলতা ময়,—
নাচে তন্তু যন্ত্রে, (নীচে গায় কল্লোলিনী!)"

দশমশ্লোক, কবিবর নবীনসেন লিখিত
"জুমিয়া জীবন।"

ক্রমশঃ
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

বিশেষ। গাইট বিশিষ্ট প্রান্ত অপেক্ষাকৃত সূচালো করা হয়। তা'ছাড়া চুঙারপার্শ্বে একটা সূক্ষ্মছিদ্র থাকে। সূত্রনলী চুঙার মধ্যে ভরিয়া খোলাপ্রান্তে ফুৎকার দিলেই উক্ত ছিদ্র দিয়া নলী হইতে সূত্রপ্রান্ত বাহির হইয়া আইসে।

(গ) ব্যং—একখানি মসৃণ ও ভারি বংশখণ্ড মাত্র।

"শা জাহাঁ বাদশাহ" ও তাঁহার পরিজনবর্গ।*

সম্রাট্ শা জাহাঁ দিল্লীর তক্তে সমাসীন। "শা জাহাঁ" শব্দের অর্থ "পৃথিবীর অধিপতি।" শা জাহাঁ জাহাঙ্গীর বাদশাহের পুত্র এবং আকবরের পৌত্র। "জাহাঙ্গীর" শব্দের অর্থ পৃথিবীবিজেতা ও "আকবর" শব্দের অর্থ মহান্। আকবরের পিতার নাম "হুমায়ুন" বা সৌভাগ্যবান্। তৈমুর লঙ্গ ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। শা জাহাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া তৈমুর উদ্ধগ দশম পুরুষ। "তৈমুর লঙ্গের" এক অর্থ অধিপতি বা প্রভু, অপরার্থ খঞ্জ যুবরাজ। ইয়ুরোপীয়ানেরা তৈমুর লঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ তামের লেন করিয়াছেন। এই তামের লেন বহুদেশ জয় করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

তাতার প্রদেশের অধিপতি, তৈমুর লঙ্গের কুটুম্ব ছিলেন, তৈমুর তাঁহারই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাতারের অধিবাসীরা মোগল নামে অভিহিত হইত। সেই হইতে ভারতের বৈদেশিক শাসনকর্ত্তাগণকে মোগল নাম প্রদত্ত হইয়াছে। "হিন্দুস্থান" শব্দের অর্থ হিন্দুদিগের দেশ। পাঠক যেন এরূপ অনুমান না করেন যে মোগল

---

* ফরাসী পরিব্রাজক Francis Bernier বিবৃত। বর্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি নিজে তাঁহার আখ্যায়িকা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"আট বৎসর কাল আমি রাজ সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম. সুরাট হইতে আগরা ও দিল্লী আসিতে আমার সাত সপ্তাহ কাল লাগিয়াছিল। পথে নানা কারণে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, আবার পথিমধ্যে বারংবার দস্যুর হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল, সুতরাং সম্রাট দরবারে বেতনভোগী চিকিৎসকের কাজ লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। পরে দানেসমন্দ খাঁ নামক ওমরাওয়ের অধীনে চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সম্রাটগণের অধীনে হিন্দুস্থানের শাসনবিভাগের উচ্চপদ যেখানে বিশ্বাসিতার প্রয়োজন, এবং সৈনিক বিভাগের উচ্চপদ সমূহ কেবল মোগলজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত। ঐ সকল পদে মোগল ও অন্যদেশীয় লোক উভয়ই আছে। পারস্যবাসী অনেক ব্যক্তি উক্ত উচ্চপদ সমূহে রহিয়াছেন, কতক বা আরববাসীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। বর্ণ গৌর ও ধর্ম্ম মুসলমান হইলেই যে কোন বিদেশী তখন সাধারণতঃ মোগল পদ বাচ্য হয়। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয়গণ সাধারণতঃ "ফিরিঙ্গী" নামে অভিহিত, আর কটা চামড়া ও পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই সাধারণতঃ হিন্দু নামে পরিচিত।

আমি ভারতে পদার্পণ করিয়া শুনিলাম—"পৃথিবীর অধিপতি" শা জাহাঁর বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর, তাঁহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার চারি পুত্রকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন চারিটি প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রায় বৎসরেক কাল হইল তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। প্রজাবর্গ আশঙ্কা করিতেছেন যে ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। সম্রাটের বার্দ্ধক্য ও পীড়ার কথা ভাবিয়া পুত্রগণের প্রত্যেকেই সিংহাসন লাভের জন্য সমুৎসুক এবং তজ্জন্য আজ ৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে।

শা জাহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দারা বা দরায়ুন; দ্বিতীয়ের নাম সুলতান সুজা বা "সাহসী যুবরাজ," তৃতীয়ের নাম আওরঙ্গজেব বা "সিংহাসনের অলঙ্কার," কনিষ্ঠের নাম মোরাদ বক্স বা "সিদ্ধ মনোরথ" জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবা বা প্রধানা রাজকুমারী নামে অভিহিতা এবং কনিষ্ঠার নাম রোসিনারা বেগম বা কুমারীগণের "আলোক" বা "আলোকিতা মানস শালিনী" রাজকুমারী।

রাজপরিবারস্থ লোকদিগের এরূপ সার্থক নামকরণ এদেশের একটি প্রথা। শা জাহাঁ বাদশাহের যে স্ত্রী সৌন্দর্য্যের জন্য পৃথিবীখ্যাত এবং যাঁহার কবর মিশরদেশস্থ কদাকার প্রস্তর রাশি পিরামিড্ অপেক্ষা পৃথিবীর আশ্চর্য্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবার অধিকতর উপযুক্ত, তাঁহার নাম এই প্রথানুসারেই "তাজমহল" বা অন্তঃপুরের শিরোমুকুট রাখা হইয়াছিল। এই প্রথানুসারেই জাহাঙ্গীর বাদশাহ-পত্নী, যিনি বিলাস ও মদ্যপানে নিমগ্ন স্বামীর প্রতিনিধি স্বরূপে বহুকাল রাজ্যের শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, প্রথমে "নুর মহল" বা অন্তঃপুরের আলোক হইতে পরে "নুর জাহাঁ" বেগম বা পৃথিবীর আলোক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

ইয়ুরোপ খণ্ডের ভূস্বামিত্ব সূচক উপাধির ন্যায় এখানে পদস্থব্যক্তি বর্গকে কোন উপাধি প্রদত্ত না হইয়া এদেশে এরূপ উপাধি দান করিবার কারণ এই যে এখানে সমগ্র ভূখণ্ড বাদশাহের সম্পত্তি সুতরাং ইয়ুরোপের ন্যায় এখানে ডিউক, আরল, মার্কুইস্ প্রভৃতির ন্যায় ভূস্বামি নাই। বাদশাহ নগদ টাকা বা ভূসম্পত্তি যাহা বৃত্তি-স্বরূপ দান করেন, তাহা স্বেচ্ছায় কমাইতে বাড়াইতে অথবা একে-বারেই প্রত্যাহার করিতে পারেন।

এই কারণেই যে ওমরাহগণকে এইরূপ উপাধি প্রদত্ত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। একজনের উপাধি রাজ-অন্দাজ খাঁ অর্থাৎ বজ্র-প্রয়োগ কর্ত্তা, একজনের উপাধি সউক-চুকন খাঁ অর্থাৎ উচ্চপদ-সংহার কর্ত্তা, তৃতীয়ের উপাধি বরক্-অন্দাজ খাঁ অর্থাৎ বজ্র নিক্ষেপ কর্ত্তা, অপর দিয়ানেৎ খাঁ অর্থাৎ বিশ্বাসী প্রভু, দানেশমন্দ খাঁ বা বিদ্বান্ পুত্র কমল খাঁ বা পূর্ণশ্রীরূপ।

দারার সদ্গুণের অভাব ছিল না; লোকজনের সহিত কথোপ-

কথন কালে শিষ্টাচার, রসিকতা, ভদ্রব্যবহার, সদাশয়তা প্রভৃতি গুণ তাঁহাতে আছে। কিন্তু তিনি বড়ই দৃপ্ত। মনে করিতেন, তাঁহার মানসিক শক্তির বলে তিনি সকল কর্ম্ম করিতে সক্ষম; এবং ভাবিতেন এমন অপর কোন লোক নাই যাঁহার পরামর্শ বা উপদেশ তাঁহার উপকারে আসিতে পারে। যাহারা তাঁহাকে কোন পরামর্শ দিত তাহাদের প্রতি তিনি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, এজন্ত তাঁহার অকপট বন্ধুগণও, তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে, সে কথা তাঁহার সমক্ষে বলিতে সাহস পাইতেন না। তিনি সামান্য কারণেই চটিয়া উঠিতেন, লোককে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন; এবং প্রধানতম ওমরাহগণকে গালি দিতে বা অপমান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার বদ্ মেজাজ বড় বেশীক্ষণ থাকিত না। মুসলমানকুলে তাঁহার জন্ম—এজন্য প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সমূহে নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন, কিন্তু অপ্রকাশে পৌত্তলিকদিগের সহিত পৌত্তলিকের এবং খৃষ্টানের সহিত খৃষ্টানের ন্যায় ব্যবহার করিতেন তিনি প্রায় সর্ব্বদাই হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ কোননা কোন পণ্ডিত সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহাদিগকে প্রভূত পরিমাণে বৃত্তি দিতেন, আর অনেকে বলেন ইঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি স্বধর্ম্মবিরোধী বিবিধ মত শিক্ষা করেন। জেসুট খৃষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত পাদ্রি বার্জ নামক একজন ধর্ম্ম প্রচারকের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল, তাঁহার প্রচারিত মতের প্রতি ও দারা আস্থা প্রকাশ করেন। যাঁহা হউক কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক কোন ধর্ম্মমতেই দারার আস্থা ছিল না, কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বা আমোদের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে এরূপ বহুরূপী সাজিতেন; আবার কেহ কেহ বলেন যে গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধিই, তাঁহার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণের কারণ ছিল।

তাঁহার সৈন্যমধ্যে অনেক গোলন্দাজ খৃষ্টান ছিল, তাহাদের সদ্ভাব আকর্ষণ জন্য খৃষ্টান সাজিতেন; আর মিত্র হিন্দুরাজগণের প্রীত্যর্থে হিন্দুধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করিতেন। এই সকল ব্যক্তিবর্গের সহিত সম্প্রীতি রাখা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইহাদিগের সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মান্তরের অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাই তাঁহার ঘোর অনর্থের কারণ হইয়া ছিল। কারণ পরে দেখা যাইবে তিনি বিধর্ম্মী কাফের হইয়া উঠিয়াছেন এই অভিযোগে তাঁহার ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব তাঁহার শিরশ্ছেদনের দণ্ড দান করেন।

শাজাহাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজার প্রকৃতি প্রায় দারার অনুরূপ ছিল। কিন্তু দারা অপেক্ষা তিনি সদ্বিবেচক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং সদালাপে ও শিষ্টাচারে দারা অপেক্ষা ভাল ছিলেন। গূঢ় ষড়যন্ত্র পরিচালনে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এবং গোপনে প্রভুত্ব ও উপর্য্যুপরি অর্থদানে বড় বড় ওমরাহগণকে কিরূপে হস্তগত করিতে হয় বিশেষতঃ যশোবন্ত সিংহের ন্যায় রাজগণকে কিরূপে স্বপক্ষে আনা যায় তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি বড়ই ভোগ-সুখরত ছিলেন, এবং প্রায়ই বহুসংখ্যক রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া নৃত্য-গীত ও মদ্যপানে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার দিন রাত্র জ্ঞান থাকিত না; তাঁহার পারিষদবর্গ সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনে ব্যস্ত সুতরাং কেহই তাঁহাকে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইত না; এজন্য রাজকার্য্যের নানারূপ ব্যাঘাত হইত এবং প্রজাগণও ক্রমশ তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও ভক্তিশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সুলতান সুজার পিতা ও ভ্রাতাগণ তুর্কদেশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু তিনি নিজে পারসিসম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেন। মুসলমান-

দিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে। এই বহু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া গোলেস্তাঁ কাব্যের রচয়িতা শেখ সাদি এই কবিতাটী লিখিয়াছেন

"আমি মদপায়ী দরবেশ, আমায় ধর্ম্মহীন বলিয়া মনে হইবে
কিন্তু আমি বাহাত্তর সম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি।"

এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটির ভিতর ঘোর বিরোধ দেখা যায়। ইহারা পরস্পরে পরস্পরের পরম শত্রু। তুর্কগণ এক সম্প্রদায় ভুক্ত, পারশ্যবাসীরা ইহাদিগকে ওসমানলি অর্থাৎ ওসমানের অনুবর্ত্তী নামে ব্যাখ্যাত করিয়া থাকে। তুর্করা ওসমানকেই সর্ব্বপ্রধান খলিফা মানিয়া অর্থাৎ মহম্মদের প্রকৃত এবং ধর্ম্ম সঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করে। কোরানের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করার এবং কোন বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করার ক্ষমতা কেবল মাত্র ইঁহারই আছে বলিয়া স্বীকার করে। পারসিয়ানগণ অপর সম্প্রদায়ভুক্ত, তুর্কেরা ইহাদিগকে সিয়া, রাফেজাসো বা আলিমর্দ্দন নামে অভিহিত করে, এই শব্দ ত্রিতয়ের অর্থ সাম্প্রদায়িক, অবিশ্বাসী ও আলির অনুচর। কারণ পারসিয়ান্দিগের বিশ্বাস মহম্মদের জামাতা আলিই মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও তাঁহার ধর্ম্মাসনে বসিবার উপযুক্ত।

সুলতান সুজা যে আপনাকে পারসিক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহার উদ্দেশ্য বেশ বুঝা যায় যে রাজনৈতিক। কারণ মোগল সাম্রাজ্যে যতগুলি উচ্চপদ ছিল তাহার অধিকাংশই প্রায় ইহাদিগের অধিকৃত ছিল এবং সম্রাট্ দরবারে ইহাদিগের ক্ষমতাই প্রবল ছিল, অতএব যখন প্রয়োজন পড়িবে তখন ইহাদের সহায়তা পাওয়া যাইবে, এই আশায়ই সুজা ঐরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় ভ্রাতা দারার ন্যায় অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা তিনি বিচক্ষণ ছিলেন এবং বিশ্বাসী ও কার্য্যদক্ষ পারিষদ্

নির্ব্বাচনে তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক পারদর্শিতা ছিল। যাহাদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের বা রক্ষা করা প্রয়োজন তিনি বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকেই প্রচুর অর্থ দান করিতেন। তিনি স্বল্পভাষী, ধূর্ত্ত ও কপটচূড়ামণি ছিলেন। যখন পিতার সহিত থাকিতেন তখন তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব দেখাইতেন বটে, কিন্তু অন্তরে কুত্রাপি তাহা অনুভব করিতেন না। পার্থিব ঐশ্বর্য্যগৌরবের প্রতি বৈরাগ্য ভাব দেখাইতেন কিন্তু গোপনে ভবিষ্যৎ সিংহাসনারোহণের পথ সুগম করিবার জন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। এমন কি যখন তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন তখন তাঁহার ভাব দেখিয়া অনেকেরই প্রতীতি হইয়াছিল যে যদি তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া দরবেশ ফকীর হইতে পান তাহাহইলে তিনি অধিকতর সুখী হইবেন, রাজ্য শাসন কার্য্যের দায়িত্ব, তজ্জনিত উদ্বেগ, তাঁহার আদৌ অভিলষিত নহে। যদি জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কেবল ঈশ্বরোপাসনায় এবং অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যে ক্ষেপণ করিতে পান তাহা হইলেই তিনি চরিতার্থ হন। বাক্যে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহার এরূপ পরিচয় দিয়াও চিরজীবনই তিনি অব্যাহতরূপ ষড়-যন্ত্র ও ছলনাময় কৌশলদ্বারা স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু এরূপ নৈপুণ্য-সহকারে স্বীয় চাতুরী গোপন করিতে পারিতেন যে দারা ব্যতীত সম্রাটের অপর কোন সভাসদই তাঁহার প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। শাজাঁহা ঔরঙ্গজেবের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন বলিয়া দারা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া সহচরগণকে বলিতেন যে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে কেবল "নেমাজী" বা গোঁড়া ঔরঙ্গজেবকেই তাঁহার সন্দেহ ও ভয় হয়।

সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মোরাদ বক্স। বিচারশক্তি ও বাক্-

পটুতায় ইনি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন। বিচিত্র পান ভোজনে এবং শিকারের আমোদেই তিনি দিন কাটাইতেন। কিন্তু তিনি উদারহৃদয় ও শিষ্টাচারী ছিলেন। তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন তাঁহার গোপন করিবার কিছুই নাই। তিনি রাজসভা-সুলভ গুপ্ত ষড়যন্ত্রে ঘৃণা করিতেন এবং সর্ব্বদাই লোককে জানাইতেন যে তিনি একমাত্র তাঁহার তরবারি ও বাহুবলের উপরই নির্ভর করেন। তাঁহার অতুল সাহস ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এই সাহস যদি সুবুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি পরিচালিত হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি অপর তিন ভ্রাতার উপর জয়লাভ করিয়া হিন্দুস্থানের সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন।

শা জাহাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবা যেমন পরমা সুন্দরী ছিলেন তেমনি বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও প্রফুল্লচিত্তা ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে পূর্ণ আবেগে ভাল বাসিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই ভালবাসা লইয়া লোকে কুৎসা রটনা করিত। এই কন্যার উপর শা জাহাঁর, অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। তিনি বাদশাহের প্রাণরক্ষা বিষয়ে সতত সতর্ক থাকিতেন; নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয় নাই এরূপ কোন আহারীয় দ্রব্য তিনি বাদশাহের সম্মুখে আনিতে দিতেন না। তিনি সর্ব্বদা পিতার মেজাজ বুঝিতেন এবং তাহা ফিরাইতে পারিতেন। এরূপ অবস্থায় রাজ্যের গুরুতর ব্যাপারেও যে তাঁহার হস্ত চলিত এবং রাজদরবারে তাঁহার ক্ষমতা যে অপরিসীম ছিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার অনেক টাকা বৃত্তি ছিল, তা ছাড়া তাঁহাদ্বারা নিজের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া লইবার আশয়ে বহুব্যক্তি নানাদিক হইতে তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দান করিতেন, এজন্য তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি বরাবর দারার

পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনি যে তাঁহার পক্ষাবলম্বী তাহা প্রকাশ্যে জানাইতেন। সে জন্যই দারার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইত। ভগিনী বেগম সাহেবাকে পরমোপকারী সহায় জানিয়া দারা তাঁহার সহিত সদ্ভাবরক্ষার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে দারা ভগিনীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে সম্রাট হইলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন। হিন্দুস্থানের প্রচলিত বিধি অনুসারে এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ। এখানে বাদশাহের কন্যাগণ বিবাহ করিতে পান না; কারণ এই যে কোন পুরুষই রাজকুমারীগণের সমান পদস্থ নহেন অতএব তাঁহাদের পাণিগ্রহণের অনুপযুক্ত। তদ্ব্যতীত পাছে রাজজামাতা ক্রমে পরাক্রমশালী হইয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্তির আশা করেন এ ভয়ও এই প্রথার মূলে আছে।

বেগম সাহেবার গুপ্তপ্রেম সম্বন্ধে আমি এ স্থলে দুইটি গল্পের উল্লেখ করিব। অমূলক উপন্যাস লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন। আমি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা; এই জাতির রীতিনীতি বিষয়ে যথাযথ বর্ণনা করাই আমার লিখিবার উদ্দেশ্য। সর্ব্বদেশেই অবৈধ প্রণয়কীর্ত্তি দোষাবহ, কিন্তু এসিয়ায় ইহার ফল যেরূপ ভয়াবহ ইয়োরোপখণ্ডে সেরূপ নহে। ফ্রান্সে এরূপ গুপ্তপ্রেমকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহা আমোদের বিষয় হয়। লোকে কিছুদিন তাহা লইয়া হাস্য পরিহাস করে, তাহার পর সমস্ত কথা ভুলিয়া যায় কিন্তু পৃথিবীর এই ভূভাগে প্রায় সর্ব্বস্থানেই গুপ্তপ্রেমের পরিণাম ঘোর বিপদ বা প্রাণ বিসর্জ্জন।

বেগম সাহেবা অন্তঃপুরবাসিনী ও বহু পরিচারিণী পরিবৃতা হইয়াও

একটি যুবকের প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়েন। উক্ত যুবক তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। এই ব্যক্তি রূপবান কিন্তু সামান্য বংশ সম্ভূত। চারিদিকে বহুসংখক রমণী প্রহরী, তাহার অনেকেই তাঁহার উপর ঈর্ষান্বিত, এরূপ অবস্থায় তাঁহার এরূপ আচরণ অধিক দিন গোপন থাকিবার কথা নহে। কথা শা জাহাঁর কাণে আসিল; তিনি একদিন অসময়ে হঠাৎ কন্যার গৃহে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত অবস্থায় হঠাৎ সম্রাটের শুভাগমনে প্রণয়ীকে লুকাইয়া রাখিবার আর কোন স্থান ছিল না। তাঁহার স্নানের জল গরম করিবার জন্য বৃহৎ কটাহ ছিল, ভয়ত্রস্ত প্রণয়ী যুবক তাহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাদশাহের মুখে কোনরূপ বিস্ময় বা অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গেলনা। তিনি কন্যার সহিত অন্য সময়ে যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহেন, সেইরূপ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, পরিশেষে বলিলেন বেগমসাহেবার গায়ে ময়লা পড়িয়াছে, বোধ হয় অনেক দিন স্নান করেন নাই, স্নানের প্রয়োজন। তাহার পর নপুংসকদিগকে কটাহের নীচে অগ্নি জ্বালিতে আদেশ করিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ইঙ্গিতে জানাইল যে হতভাগার প্রাণবায়ু শেষ হইয়াছে. ততক্ষণ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না।

এই ঘটনার পর বেগমসাহেবা আর এক প্রণয়কীর্ত্তি করিয়াছিলেন, তাহার পরিণামও শোকাবহ। তিনি নাজির খাঁ নামক একজন পারসিক যুবককে আপনার খানসামা পদে বাহাল্ করিলেন। এই যুবক সম্ভ্রান্তবংশ সম্ভূত, দেখিতে সুশ্রী; ইহার অনেক মানসিক সদ্‌গুণ ছিল, আদব্ কায়দা দোরস্ত ছিল, মনে তেজ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল; রাজসভায় সকলেই তাহাকে ভাল বাসিতেন। ঔরঙ্গজেবের মাতুল তাঁহাকে ভাল বাসিতেন এবং আদর করিতেন, এবং একদা বাদশাহ

সকাশে বেগমসাহেবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব বাদশাহের ভাল লাগিল না। ইনি পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন যে এই যুবকের সহিত বেগমসাহেবার অবৈধ প্রসক্তি ঘটিয়াছে, সুতরাং এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে তাঁহার অধিকক্ষণ সময় লাগিল না। বাদশাহ মুখে কিছু বলিলেন না, প্রত্যুত বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন জন্য সমস্ত পারিষদ-বর্গের সমক্ষে স্বহস্তে যুবককে পানের খিলি উপহার দিলেন। হতভাগ্য যুবক প্রচলিত প্রথা অনুসারে ঐ খিলি চিবাইল, তাহার মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা দ্বিধা হইল না। বাদশাহ যে স্বহস্তে তাহাকে বিষদান করিয়াছেন, সে তাহা জানিত না, রাজ প্রসাদ হইতে বিদায় লইয়া পালকী চড়িয়া গৃহাভিমুখে চলিল। বাদশাহের ভাবী জামাতা হইবে কল্পনায় কত সুখের স্বপ্ন দেখিল। কিন্তু হায়, বিষ এরূপ তীব্র যে তাহার ক্রিয়া তখনই ফলিল, পালকীর মধ্যেই হতভাগার মৃত্যু হইল। পান খাওয়া এদেশের একট পদ্ধতি। পানের পাতায় চূণ দিয়া অন্যান্য সুগন্ধি মশলা দিয়া ভারতবর্ষীয়েরা খিলি প্রস্তুত করে। এই খিলি চিবাইলে ঠোঁট রাঙ্গা হয় এবং মুখে সুগন্ধ হয়।

সম্রাটের কনিষ্ঠা কন্যা রোসিনারা বেগম তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বেগম সাহেবার ন্যায় সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন না বটে, কিন্তু জীবন্ত স্ফূর্ত্তি ও বিলাসপরায়ণতায় তাঁহার সমকক্ষা ছিলেন। তিনি উৎসাহ সহকারে ঔরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বেগম সাহেবা এবং দারার প্রতি তাঁহার বৈর ভাব গোপন করিবার কোন প্রয়াস পাইতেন না। এই কারণেই বোধ হয় তিনি প্রচুর ধন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই এবং রাজকীয় ব্যাপারে বড় একটা লিপ্ত হইতে পারিতেন না। তথাপি

তিনি রাজান্তঃপুরবাসিনী ও চতুরা ছিলেন, সে জন্য রাজকীয় অনেক গোপনীয় সংবাদ রাখিতেন এবং গুপ্ত চরদ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করিতেন।

ভ্রাতৃগণের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই শাজাহাঁ স্বীয় পুত্রগণের উদ্ধতস্বভাব জন্য বিশেষ উদ্বিগ্নও ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত এবং বিবাহিত; রক্ত সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া ভাই ভাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন এবং সকলেই সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন, কাজেই বাদশাহের সভামধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন দল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট্ নিজের প্রাণভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাঁহার হৃদয়ে তাহার একটা কৃষ্ণ ছায়াপাত হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা হইত পুত্রগণকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। এই দুর্গটি একটি দুর্গম ও উচ্চ পর্ব্বত শিখরে স্থাপিত, হঠাৎ কেহ ইহা আক্রমণ করিতে সক্ষম নহে। এই দুর্গ মধ্যে রাজবংশের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে কারারুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, পুত্রগণ তখন সকলেই প্রবলপরাক্রান্ত, এরূপ হঠকারিতা দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবার উপায় ছিল না। সেই জন্য নিজকে নিরাপদে রাখিবার জন্য পুত্রগণকে তিনি দূরবর্ত্তী চারিটি প্রদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া নিজ হইতে অন্তরে রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। সুলতান সুজা বাঙ্গালার সুবাদারীর নিযুক্ত হইলেন; ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলেন; মোরাদবক্স গুজরাটে এবং দারা কাবুল ও মুলতানে প্রেরিত হইলেন। প্রথমোক্ত তিনজন শাহজাদা অবিলম্বে স্ব স্ব প্রদেশে প্রয়াণ করিলেন, এবং যে ভাবে নিজ নিজ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় অধিক

দিন অপ্রকাশিত রহিল না। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন রাজার ন্যায় কার্য্য চালাইতে লাগিলেন, স্ব স্ব রাজ্যের সমস্ত রাজস্ব তাঁহারা আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন, এবং স্ব স্ব রাজ্যে শান্তি স্থাপন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের সম্মান লাভ ব্যপদেশে সৈন্য সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। দারা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতরাং সিংহাসনে তাঁহার ন্যায্য অধিকার, এবং অচিরমধ্যেই পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইবেন এই আশায় তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন না। বৃদ্ধ সম্রাট্ দারার সেরূপ মনোভাব অবগত হইয়া প্রকাশ্যে তাঁহার সংকল্পে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের সিংহাসনের নিম্নেই প্রধান ওমরাওদিগের আসন শ্রেণীর মধ্যে একটি নূতন সিংহাসন স্থাপিত করিয়া দারাকে তদুপরি উপবেশন করিবার অনুমতি দিলেন, এবং তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ দারাও রাজাজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞা সম্রাটের আজ্ঞার ন্যায় প্রতিপালিত হইবে এরূপ ব্যবস্থা করিলেন। লোকে বুঝিল এখন হইতে দুজন বাদশাহ সমান ক্ষমতার সঙ্গে সম্রাজ্য শাসন করিবেন। কিন্তু দারার প্রতি শাজাঁহার ব্যবহার যে কপটতাপূর্ণ তাহা বলা অনাবশ্যক।

ক্রমশঃ

প্রশ্ন

চাকুরীতে মনুষ্যত্ব লোপের আশঙ্কা এজন্য চাকরী না করিবার জন্য আজকাল অনেকেই পরামর্শ দেন, কিন্তু ব্যবসা করিবার মূলধন বা চাষের উপযুক্ত জমি যে সকল গৃহস্থের নাই অথচ উপার্জ্জন না করিলেও তাঁহাদের সংসার চলা কঠিন। তাঁহাদের উপায় কি?

সঞ্চয়।

ইংরাজ ও ভারতবাসী।

There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself.

Matthew Arnold.

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা কোন ছিদ্র থাকে।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্ব্বলতা সেইখানে তাহার স্নেহও বেশী। ইংরাজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন্"পুঙ্গব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি তেমনি ইংরাজ সর্ব্বত্রই খাড়া ইংরাজ, কিছুতেই তাহার আর অন্যথা হইবার জো নাই।

এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরাজের চরিত্রের এই ছিদ্রটী অলক্ষীর একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরাজ সে ছিদ্র যত্নপূর্ব্বক রোধ করে, যেখানে যত পথ ঘাট আছে সর্ব্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশঙ্কার অঙ্কুরটি পর্য্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে একটি নৈতিক বিঘ্ন আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দ্দম করিয়া তুলিতেছে—কখন কখন অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে—কিন্তু মমতাবশতঃ কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন একজন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্রময় হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে পাছে পাখীতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়। পাখী পলাইতেছে বটে কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোন খেয়াল নাই।

আমাদের কোন শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল

বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওয়ালার যে কোন লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজ সর্ব্বত্রই ইংরাজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্লণ্ডের সহিত ইংরাজের যে সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে ইংরাজের সহিত ইংরাজিশিক্ষিতদের ক্রমশই একটা অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইট্‌টির পরিবর্ত্তে পাট্‌কেল্‌টি চলিতেছেই।

আমরা যে, সকল জায়গায় সুবিচারপূর্ব্বক পাট্‌কেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি। আমাদের কাগজে পত্রে অনেক সময় আমরা অন্যায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং অমূলক কোন্দল উত্থাপন করি, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা, কোনোটা ন্যায় কোনোটা অন্যায় হইতে পারে; আসল বিচার্য্য বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? শাসনকর্ত্তা খবরের কাগজের কোন একটা প্রবন্ধ বিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে পারে, কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই যে সমস্ত ছোট ছোট কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কি প্রতিকার করা হইল?

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যেই প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা যোগে ইংরাজরাজের আর সর্ব্বত্রই গতিবিধি আছে কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয় ত সে জায়গাটাতে

প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরাজের মেরুদণ্ড কোনখানেই বাঁকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরাজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অপ্রিয় সমালোচনা চলিতেছে ইহার সহিত "পীপ্‌লের" কোন যোগ নাই;—এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওয়ালার বুজরুগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভাল; বাহিরে যে একটু-আধটু বিকৃতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে চতুর লোকে রঙ করিয়া দিয়াছে। তবে ত আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই; কেবল যে চতুর লোক-টাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ঐটেই ইংরাজের দোষ। সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না;—যে পরিমাণে দূরে থাকা যায় সেই পরিমাণেই নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। মানুষ ত জড়যন্ত্র নহে, যে, তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন কি পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয় তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে তাহাদের অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোন মতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে।

তাহার পরে সে ক্লবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড্ খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীর মনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইহারা দয়া করে না উপকার করে, স্নেহ করে না রক্ষা করে, শ্রদ্ধা করে না অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শস্য উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে? এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে, যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার ফল ফলে না?

আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরাজকৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহারা মনের মধ্যে কিছুতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোন ক্রমে তাহারা কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে পত্রে কথায় বার্ত্তায় ইংরাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরাজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না, অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুঙ্কার দিয়া উঠে।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয় ত যেখানে পাঁচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্রভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অনুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই সেখানেও অপর পক্ষ বিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অনুষ্ঠানমাত্রেই আপষ ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুশৃঙ্খলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড় বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে হয় তখন সংযম, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে জানা চাই গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে না; সে আপনার বৃহত্ত্বে অভিভূত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে একটুখানি নড়িতে হইলেই অনেক দূর হইতে অনেকগুলা কল চালনা করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না—যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মত কোন একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্মেণ্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃত পক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপে সঙ্কটে পড়িতে হয় ইল্‌বার্ট বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সৎপথে এবং ন্যায়পথেও রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল করিয়া লাইন্ পাতিতে হইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায় তার পরে দ্রুতবেগে চলিবার খুব সুবিধা হয়।

ইংলণ্ডে রাজাপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই; এবং সেখানে রাজ্যতন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়। অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার

যুক্তি দ্বারা প্রস্তাব বিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবামাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্ব্বাংশে দুর্ব্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্মেণ্টকে বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যাপারে সর্ব্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্যায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছিনা শ্বশুড়বাড়ি যাইতেছি তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সেস্থলে পুকুরটা ঘুরিয়া যাওয়াই ভাল। আমাদের রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি, যেখানে ক্ষীরটা সরটা মাছের মুড়াটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লঙ্ঘন করিলে চলে সেখানে লঙ্ঘন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভাল।

ডিপ্লম্যাসি অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সে দিক দিয়া যাই না। আমরা "কাজ পাই বা না পাই কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে; তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা ছুয়ো দিবার, বাহাবা লইবার, এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ

পাইলে আমরা এত খুসি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এবং কটু ভর্ৎসনার পর সঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেণ্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন একটা অসদ্ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, যে, উভয়পক্ষেরই কর্ত্তব্যপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভাল হইতেছে না। গবর্মেণ্টও বাহ্যতঃ যেমনই হৌক্, মনে মনে যে এ সম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কি? বৃটিশ চরিত্র, হাজার হৌক, মনুষ্যচরিত্র ত বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

সব প্রথম সঙ্কট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধুইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণ সম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড় কঠিন। শ্বেতকায় আর্য্যগণ কালো রঙটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরাজি তর্জ্জমা এবং এন্‌সাইক্লোপীডিয়া হইতে এ সম্বন্ধে অধ্যায়, সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক সমেত উৎকট প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে চাহি না—কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেতকৃষ্ণে যেন দিন-রাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্ম্মশীল, অনুসন্ধান-তৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্ম্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই শ্যামা-প্রকৃতিতে হয় ত রাত্রির মত একটা গভীরতা, মাধুর্য্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাঙ্গের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ কথা বলিয়াও কোন ফল নাই যে,

কালো গরুতেও শাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ সকল ওরিয়েণ্টাল্ উপমা তুলনায়—কথাটা এই যে কালো রঙ দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ অভ্যাস আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলি প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্দ্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সদ্‌গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় সৌখীন জাতীয় উদ্ভিজ্জের মত নহে, তাহাকে যে জিন বনাতের দ্বারা না মুড়িলেও অন্য উপায়ে রক্ষা করা যায় সে সমস্ত তর্ক করা মিথ্যা। ইহা তর্কের কথা নহে সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংস্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু ঐ সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। যখন ষ্টীমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরাজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পালাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধূলা ধৌত করিয়া আসেন এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয় সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এই জন্য যে দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে জাতিকে শাসন করিতেছেন সে জাতিকে ভাল না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয়া দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক ত, আমরা সহজেই বিদেশী—এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরাজের স্বভাবতই অরুচিকর, তাহার উপরে আরো একটা উপসর্গ আছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ সমাজ এদেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাই-তেছে। যদিও বা কোন ইংরাজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তাগুণে বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরাজ সমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতি সমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলংঘ্য বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজ-দুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধীপক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয় রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়াজনক। সে জন্য তাঁহাদের কি দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্ট দোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই।

তাহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরাজেরা যে ভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলাকহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদেব প্রতি যে সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নবাগত ইংরাজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল এবং ইংরাজকৃত অসম্মানের কোন প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতী ইংরাজ আসিয়া দেখে যে, আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে, যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা ভ্রাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারের জীবন-ধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালী কর্ম্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্ব্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কি অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক, যে, সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধান বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়সাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি এক-মুহূর্ত্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে? আমরা কি ইংরাজের মত স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন! আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়! ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

কিন্তু সে কথা ইংরাজের বুঝিবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে, ভীরুতা। নিজের জন্য ভীরুতা ও পরের জন্য ভীরুতার প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোন কথার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভীরু শব্দটা মনে উদয় হইবামাত্র তৎসম্বলিত দৃঢ়বদ্ধমূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বৃহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরাজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ছোটহাজরির অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণবৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের বিশেষতঃ শিক্ষিত "বাবু"দের প্রতি ইংরাজের অরুচি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গবীবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কি প্রতিশোধ লইতে পারি! আমরা ইংরাজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম! আমরা রাগিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরাজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মর্দ্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। এইরূপ মর্দ্দন করিবার ছোট বড় কত প্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর মফস্বলের লোকের অবিদিত নাই। ইংরাজ আমাদের প্রতি মনে মনে যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা, আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরাজী কাগজ ভারতশাসনকার্য্য দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। আর আমরা ইংরাজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ পর্য্যন্ত ভারত-অধিকার কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরাজের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয় তখন এখনকার ত আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপদ্রব করিতে পারিত তাহাদের নখদন্ত গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্য্যের জন্যই সৈন্য পাওয়া ক্রমশঃ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরাজ "সিডিশন" দমনের জন্য সর্ব্বদা উদ্যত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোন অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

তত্রাচ উহা অতিসাবধানমাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরাজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজকার্য্যের বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। ববং উদাসীনভাবেও কর্ত্তব্যপালন করা যায় কিন্তু আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্ত্তব্যপালন করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত।

তথাপি, অমানুষিক ক্ষমতা-বলে সমস্ত কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিলেও সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম্ম আপনার সমঐক্য অন্বেষণ করা। এমন কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরেব সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যত প্রকার সুবিধা থাক্ সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায় প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত কিন্তু অসম্মান করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোন লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইংরাজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি ইহারা ময়দানবের বংশ—ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিত মনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের মাল সস্তায় কিনি এবং মনে করি ইংরাজের মুল্লুকে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার চিন্তা করিবার চেষ্টা করিবার নাই—কেবল, পূর্ব্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিষ এবং উকীলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের একভাগ যেরূপ নিশ্চিত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে এমন কি, মনের গভীরতর মূলে ভার বোধ হইতে থাকে। খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়, ইংরাজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে যোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র কিন্তু পাইতেছি না। ইংরাজের সকল কার্য্যের ফলভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না, এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ আছে, আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোন মাহাত্ম্য এবং কোন সুবিধা নাই? বর্ত্তমান কালের ভারত রাজনীতির সেই কি সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে?

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে ত দেখান গিয়াছে যে, রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুরূহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্ত্তমান। কোন কোন সহৃদয় ইংরাজও সে জন্য অনেক সময় চিন্তা ও দুঃখ অনুভব করেন। তবু যাহা অসম্ভব যাহা অসাধ্য তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া ফল কি?

কিন্তু বৃহৎ কার্য্য মহৎ, অনুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে? এই ভারতজয় ভারতশাসনকার্য্যে ইংরাজের যে সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সে গুলি কি সুলভ গুণ? সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগস্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন? আর পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্য যে দুর্লভ সহৃদয়তা গুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে?

ইংরাজ কবিগণ গ্রীস ইটালী হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাহাত্মা এড্‌বিন আর্ণল্‌ড্‌ ব্যতীত আর কোন ইংরাজ কবি কোন প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই। বরঞ্চ শুনিয়াছি নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোন কোন বড় কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংবাজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই আধুনিক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাড্‌ইয়ার্ড্‌ কিপ্লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরাজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরাজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌ বলিতেছেন;—"এই সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এক একটি দ্বীপের মত বোধ হয়! চারিদিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা,—অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড—সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান এবং সবুজবর্ণ টিয়া পাখী, চিল এবং কুম্ভীর, এবং লম্বা ঘাসের নির্জ্জনক্ষেত্র। এই মরু-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধবা মহারাণীর কার্য্য করিতে

এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্ব্বদেশীয় ধনসম্পদপূর্ণ বর্ব্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।" ইংরাজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ ত এমন নয়! কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষ কি এত তফাৎ!

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ কি পরিমাণে খাদ্যাভাব হইতেছে এবং ভারতবর্ষ তাহা কি পরিমাণে পূরণ করিতেছে এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির মত দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোল বিচালি যোগাইতে কোন আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখন দৌরাত্ম্য করে সে জন্য শিং দুটা ঘসিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকেও একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজী উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ! তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাত্র! কত বারম্বার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনো মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই—অর্থাৎ সে স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর হতভাগ্য ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই

হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে কথার কোন আভাস মাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দ্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাকৃটিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন দরে সের দরে, টাকার দরে শিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন? ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার ল্যাজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই ত ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি! যেমন রৌদ্র তেমনি ধূলা! কেবলি পাখার বাতাস এবং বরফ জল না খাইলে সাহেব বাঁচে না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ্ন প্লীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং বরফ সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ভারতবর্ষ ইংরাজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্ব্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরাজকে কি দিতে পারে!

হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না; তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না! এখন দেখ, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়! তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস কর; খস্‌-খসের পর্দ্দা টাঙাইয়া জল সেচন কর, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোল, তোমার সিন্ধুকটা খোল, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় কর, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে,

তবু তোমার বাপের বাড়ীর নিন্দা করিবে। আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝঙ্কার সহকারে দু কথা পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেছ; কাজ নাই বকাবকি করিয়া; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে আরামে থাকে একমনে তাহাই সাধন কর! তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক্!

ইংরাজ রাজকবি টেনিসন্ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবিবর উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ আবুল্‌ফজ্‌লের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্ম্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম ও শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তীগণ সে চেষ্টা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সূর্য্যাস্তের দিক্ হইতে একদল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাৎ মন্দিরকে, একটি একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং ন্যায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সফল হউক্ প্রার্থনা করি। আজ পর্য্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে; বল, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই কিন্তু এখনো এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্ম্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্ম্মের অন্তরে

প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্সী ধর্ম্মজ্ঞদিগের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রীসভায়, হিন্দুবীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্ম্মে কোন হস্তক্ষেপ করে না,—কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম, না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু এক জন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরো কঠিন এইজন্য, যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের ঘের দিয়া প্রতিদিন সে পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের অভাব আমরা আজকাল এত অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যে, আজকাল হিন্দু মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলা কহা করি? আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরাজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। তাহাদের রাজ্যনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে—কিন্তু আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংরাজের পলিসির

মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা শাসনের দ্বারা এক করা যায় না—অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালবাসিতে হয়—আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিস্ মোতাইন্ করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তি স্থাপন করায় দুর্দ্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা ঠিক আক্‌বরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না এবং সূর্য্যাস্ত-ভূমির কবিগণ অলীক অহঙ্কার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত সুগভীর আক্ষেপের সহিত স্বজাতিকে লাঞ্ছনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাঁহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিত-বর্গেরও উপকার হয়। ইংরাজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব্ব জাত্যহঙ্কার কি যথেষ্ট নাই, কবি কি কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন? এখনো কি নম্রতা শিক্ষা ও প্রেমচর্চ্চার সময় হয় নাই? সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিয়া এখনো কি ইংরাজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মত অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ সকল কথা কেমন শোভন হয় না, সেই জন্য বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করার মত দীনতা আর কিছু নাই। এবং এ সম্বন্ধে দুই এক কথা আমাদিগকে মাঝে মাঝে শুনিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন নব্য বাঙালীদের অনেকগুলা ভাল লক্ষণ আছে কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি সিম্প্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড় বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যে ভাবে কথাগুলা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরাজের

কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন "তৃষার্ত্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল" আমাদের রাজা তখন "তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল!" আধখানা বেল সময় বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই এক সঙ্গে দূর হয় না। ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেণ্ট্‌ অত্যন্ত উত্তম এবং উপাদেয় কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পারে, এমন কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের ন্যায় তদ্দ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশ দেশান্তরের সকল প্রকার ভোজ্য এবং সকল প্রকার পানীয় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাঝখানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাঁহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্ত্তী ঐ বিদেশী বাঙালীটির এমন বুভুক্ষু কাঙালের মত ভাবখানা কেন?

কিন্তু স্পেক্টেটর শুনিয়া হয় ত সুখী হইবেন অতি দুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিম্প্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ উর্দ্ধে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে!

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—,তোমরা এতই কি শ্রেষ্ঠ! তোমরা না হয় কল চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। অধ্যাত্মবিদ্যার ক খ হইতে আমরা তোমাদিগকে শিখাইতে পারি। তোমরা যে আমাদিগকে স্বল্পসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর সে তোমাদের অন্ধ মূঢ়তাবশতঃ, হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা

ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই। আমরা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিব। আজ হইতে তোমাদের য়ুরোপের সুখাসক্ত চপল সভ্যতার বাল্যলীলা হইতে সমস্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি কর, আপিস কর, দোকান কর, নাচ, খেল, মার ধর, ছুটোপাটি কর এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্ম্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাক।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। যে শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে তদ্দ্বারা সে জানে, যে, এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশঃ ভারবাহী মূঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে! তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্য্যের আলোক উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি দ্বারা শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে, বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরাজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। বোধকরি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরাজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু

জীবনী শক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তি তর্ক বিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়-রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি কাব্য পুরাণ ইতিহাস দর্শনের প্রাচীন গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি—আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালমন্দ বিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

একপ্রকারের কালী আছে যাহা কাগজের গায়ে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনর্ব্বার রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালীতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় আবার শুভ দৈবক্রমে নব সভ্যতার সংস্রবে নবজীবনের উত্তাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমরা ত সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্তাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি,—যদি পূর্ব্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে—নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাজীর্ণ দেহ সভ্যতার জলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়াই সদ্গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা বর্ত্তমান সমস্যার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবখানা এই :—

ইংরাজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে। সেই বাহ্য অমিলই সর্ব্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য অনৈক্যটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যক। যে সমস্ত আচার ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরাজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্ত্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গী, এমন কি, ভাষাটা পর্য্যন্ত ইংরাজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় একথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। বাহ্য অনৈক্য লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরাজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় আমরা তোমাদেরই মত, এবং যেখানে অন্যতর কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেখানে তাড়াতাড়ি যেনতেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম্ এবং ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বে যে সহজ বেশে ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে পর্য্যন্ত না পৃথিবীতে দর্জ্জির দোকান বসিয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহাদের বেশভূষা অশ্লীলতানিবারিণী সভায় নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদেরও নব-আবরণে লজ্জা নিবারণ না করিয়া লজ্জা বৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মত দর্জ্জির এষ্টাব্লিশ্মেণ্ট এখনো খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে

না এবং তাহার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাঁহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতাবৃক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরাজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরাজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, এজন্য কেবলি তাঁহাদিগকে পর্দ্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেট্ শাস্ত্রে একটু ক্রটি হওয়া, ইংরাজি ভাষায় স্বল্প স্খলন হওয়া তাঁহারা পাতকরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পারের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা—ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরাজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরো বেশি জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং রুচিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরাজের মনটা অভ্যাসকুহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অন্যায় প্রতারিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে প্রতিহত হয়।

নব্য জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমত দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। কলকারখানা শাসনপ্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের হাতে চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া য়ুরোপ বিস্মিত হয় এবং কোথাও কোন ক্রটি খুঁজিয়া পায় না কিন্তু তথাপি য়ুরোপ আপনার বিদ্যালয়ের এই সর্দ্দার পোড়োটিকে বিলাতী বেশভূষা আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিলেই বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। জাপান নিজের এই অদ্ভুত কুরুচি, এই হাস্যজনক অসঙ্গতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ। কিন্তু য়ুরোপ এই ছদ্মবেশী আসিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধাসত্ত্বেও না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি য়ুরোপের সহিত অন্য সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর

একাত্ম হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসঙ্গতি নামক গুরুতর রুচিদোষ ঘটিবে না?

এই ত গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উপায়ে লাভ চুলায় যাক্, মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরাজের সহিত অনৈক্য ত আছেই আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরাজের মত হইয়া ইংরাজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে ভ্রাতারা ইংরাজের মত সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সঙ্কোচ বোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিবার যো নাই। আমি যে নিজগুণে ঐ সকল মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জাতিভুক্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়।

ইহার অর্থই এই—জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরাজের কাছে একরকম করিয়া বলা, যে, সাহেব, ঐ বর্ব্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর আমি যখন কতকটা তোমাদের মত চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড় আশা আছে, যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক্ যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায়· কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিম্বা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয়?

কর্ণ যখন অশ্বত্থামাকে বলেন, যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কি যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বত্থামা বলিয়াছিলেন আমি ব্রাহ্মণ সেই জন্যই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না! আচ্ছা, তবে আমার এই পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

সাহেব যদি শেক্‌হাণ্ড্‌পূর্ব্বক বলে এবং এস্কোয়ার যোজনাপূর্ব্বক লেখে, যে, আচ্ছা, তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মত তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন কি, তুমি দেখা করিলে এক আধবার

তোমার "কল্ রিটার্ণ্" করা যাইতেও পারে—তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরম সম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না বলিব—ইহারই জন্ত আমার সম্মান! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম! যতক্ষণে না আমার স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রঙ মাখিয়া এক্সেপ্‌শন্ সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি ত বলি সেই আমাদের একমাত্র ব্রত। সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সে দিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সহজ উপায়ে কোন্ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে। বড় কঠিন কাজ সেই জন্য অন্ত সমস্ত ফেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া বসিতে হইবে, যে, যতদিন না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্ম্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে, ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অযথা অনুকরণ করিয়া অকালপক্ক হইয়া যায়। সে মনে করে সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে। তাহার আর রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই—বিনয় তাহার পক্ষে বাহুল্য।

পাণ্ডবেরা পূর্ব্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বে অজ্ঞাতবাসে

থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সংসারে উদ্যোগপর্ব্বের পূর্ব্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব্ব।

আমাদেরও এখন আত্মনির্ম্মাণ জাতিনির্ম্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বড়ই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক্ক অবস্থাতেই অধীরভাবে ডিম্ব ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্ব্বল অপরিণত শরীরের পুষ্টিসাধন বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি চর্ম্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কি, যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করিনা, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্বুদের মত ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে দুই দিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন,. পরে বিকৃত, পরে নির্জ্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মত একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান্ ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হোক্ কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট,

ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্য্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্ব্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কি সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোন আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে— তাহারা কি মনে করিবে?

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূল দৃষ্টি। ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না; অবজ্ঞা-ভরেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্ তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখ—বিদেশে থাকিয়া জর্ম্মান্ যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ তেমন করে নাই। ইংরাজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই।

অতএব ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক্ ভারতবর্ষীয়ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরাজকে ইংরাজী ভাবেই মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা বাড়াইয়া লিখি। জানি, যে, ইংরাজ পীপ্‌ল্ নামক একটা পদার্থকে জুজুর মত দেখে, আমরাও সেইজন্য কোনমতে পাঁচজনকে জড় করিয়া পীপ্‌ল্ সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরাজকে ভয় দেখাই। পরস্পরকে বলি, কি করিব ভাই, এমন না

করিলে উঁহারা যদি কোন কথায় কর্ণপাত না করে তবে কি করা যায়! উঁহারা কেবল নিজের দস্তরটাই বোঝে।

এইরূপে ইংরাজের স্বভাবগুণেই আমাদিগকে ইংরাজের মত ভাণ করিয়া আড়ম্বর করিয়া তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয়। কিন্তু তবু আমি বলি, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কথা এই যে, আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্ত্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধ্‌টুকরা অনুগ্রহ না দেন ত নাই দিলেন!

কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে এ কথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড় ভয় আছে। আমরা মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক্ আত্মীয়তাপূর্ব্বক শেক্‌হাণ্ড্‌ করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন। আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁসি, সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড় বেশি—এত বেশি, যে, সে অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি ত ইংরাজি মন্দ বল না; তাহার পর হইতে বাংলার চর্চ্চা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। যে বাহিরাংশে ইংরাজের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিক্য সাধনে প্রবৃত্তি হয়, যে দিকটা য়ুরোপের চক্ষুগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই সে দিকটা অন্ধকারে, অনাদরে আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সে দিকের কোনরূপ্ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মানুষকে দোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড় স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতায় তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব আর ঐ যে রাঙা সাহেব টম্‌টম্‌ হাঁকাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কাণাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টম্‌টম্‌ থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়া বলে—"বাবু তোমার কাছে দেশালাই আছে?" তখন ইচ্ছা করে দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাৎ ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম মলিনতম কৃষক ভাইটি মা ঠাকরুণকে প্রণাম করিবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুৎসিৎ দৃশ্যটিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে; পাছে সেই বর্ব্বরের সহিত আমার কোন যোগ কোন সংস্রব কোন সুদূর ঐক্য বড় সাহেবের কল্পনা-পথে উদিত হয়!

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁসিব না তখন অহঙ্কারের সহিত বলি না, বড় বিনয়ের সহিত বড় আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্ব্বেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইবে—আমি আর নিভৃতে বসিয়া আপনার কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু করিতে থাকিবে এবং আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়ই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্ত্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরাজ তাহাদের আমোদ-প্রমোদ আহার-বিহার আসঙ্গ-প্রসঙ্গ বন্ধুত্ব প্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে তবু আমরা নত হইয়া প্রণত হইয়া ছল করিয়া কল করিয়া একটুখানি

প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজসমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে, এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, এমন স্থলে, এমন দুর্ব্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্ব্বনাশী অনুগ্রহমদ্যকে অপেয়মস্পর্শং বলিয়া সর্ব্বথা পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

আরও একটা কারণ আছে। ইংরাজের অনুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র, এবং জঠরানল কেবল সম্মানবর্ষণে শান্ত হয় না। আমরা অনুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অনুগ্রহ নহে সেই সঙ্গে কিছু অন্নেরও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেক্‌হ্যাণ্ড্ নহে চাকরিটা বেতনবৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মত আনাগোনা করি ত তৃতীয় দিনে ভিক্ষুকের মত হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সম্বন্ধটা বড়ই হীন হইয়া পড়ে। এদিকে অভিমান করি, যে, ইংরাজ আমাদিগকে সমকক্ষ ভাবের সম্মান দেয় না ওদিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরাজ আমাদের দেশী সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অনুগ্রহপ্রার্থী অথবা টাইটেল্-প্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরাজের সঙ্গে ত আমাদের দেখাশুনার কোন সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তালা। তবে আজ হঠাৎ ঐ যে লোকটা পাগ্‌ড়ি চাপকান পরিয়া শঙ্কিত গমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভদ্রের মত অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না এবং থত মত খাইয়া কথা কহিতেছে উহার সহসা এত বিরহবেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে?

যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে বিনা আদরে সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়—তাহাতে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হয় না।

ইংরাজ এদেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে তাহার অনেকটা কি আমাদেরই হীনতাবশতঃ নহে? সেই জন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংস্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরাজকে রক্ষা করিলে উহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতএব সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট-কর্ত্তব্য সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবল-মাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকার-গুলি যখন পাইব তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পূরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে, আশা করিব সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা, প্রভাবচিন্তা, ইংরাজের প্রসাদচিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য আস্ফালন বাহ্য যশখ্যাতি পরিহার করিয়া, ইংরাজ আকর্ষণের প্রবল মোহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, নিবিষ্টমনে অবিচলিতচিত্তে চরিত্রবল সঞ্চয় করিবে, জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করিবে, স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যাচরণ সত্যানুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে

তেমনি অনায়াসে স্বভাবতই আপনার সম্মান ঊর্দ্ধে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহ্বায় পরর কাছে মান যাচ্ঞা করিতে যাইবে না এবং ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ এই কথাটির সুগভীর তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে। এ কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢাল্ যে দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায়; যদি হ্যাট্‌কোট পরিয়া ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরাজের দ্বারস্থ হইয়া, ইংরাজিতে নিজেকে বড় বড় অক্ষরে তর্জ্জমা করিয়া কোন সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্পে লোকে হ্যাট্‌কোট ধরিবে, সন্তানদিগকে বহুচেষ্টায় বাংলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবান্ মহলে বেশী আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য। তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে, যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোন ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্য্য-সিদ্ধি।

শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক তাহার পর নির্জ্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্য্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া

পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জ্জন ও মার্জ্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হৌক্ সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্ত্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই ; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জন-স্রোতের আবর্ত্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন ; কোন একটি বিশেষ আইন সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের দেশের কোন যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন ; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দ্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন ; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্য সাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্য সাধনই তাঁহার ব্রত।*

* ভাণ্ডারের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নব প্রকাশিত গ্রন্থ "রাজা প্রজা" হইতে উদ্ধৃত।

মন্তব্য।

বহরমপুরের সাহিত্য-সম্মিলন ও পাবনার প্রাদেশিক-সম্মিলন ১৩১৪ সালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য সম্রাট্ পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উভয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বহরমপুরে সভাপতি মহাশয় মুখে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মর্ম্ম সাধারণে প্রকাশ নাই, তবে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত সাহিত্য-সম্মিলনীর জন্য লিখিত সভাপতি মহাশয়ের দুইটি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে দুইটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভাপতি মহাশয়ের এ বক্তৃতার কতক মর্ম্ম সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পাবনার বক্তৃতা বঙ্গদর্শনে ও পরে অন্য অন্য মাসিক ও অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় প্রকশিত হইয়াছিল, ঐ প্রবন্ধের প্রশংসা সকল দলের লোকেই শত মুখে করিতেছেন। রবীন্দ্রবাবু দেশের এই দুঃসময়ে ভাঙ্গা মন জোড়া দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ;—প্রাচীন কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"ভাঙ্গিলে গড়িতে পারে সে বড় সুজন !"

রবীন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই তাঁহার এই কৃতকার্য্যে নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়াছেন—এ দেশে সৎকার্য্যের ইহাই একমাত্র পুরস্কার।

সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের উদ্যোগ বার বার দুইবার হইয়াও সফল না হওয়ায় সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই বিশেষ দুঃখিত ছিলেন, তাঁহাদের ক্ষোভ মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মিটাইয়াছেন সেজন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদভাজন। মহারাজা বাহাদুরের অকপট সহৃদয়তা অমায়িকতা ও আতিথ্য সৎকারের আন্তরিকতায় আমরা নিতান্তই মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি প্রাণের নিদারুণ শোকের জ্বালা নীরবে পুষিয়া, গৃহের কঠিন পীড়ার উদ্বেগ হৃদয়ে চাপিয়া এই সম্মিলন উপলক্ষে যে মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছেন সে দৃষ্টান্ত সংসারে বড় সুলভ নহে।